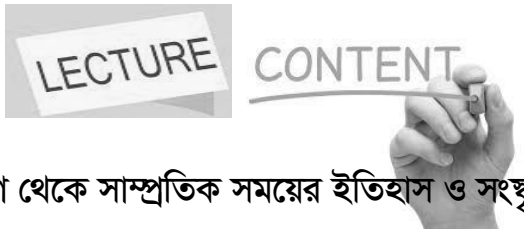

বাংলাদেশের প্রাচীন যুগ থেকে সাম্প্রতিক সময়ের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

- ☑ বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদ
- ☑ বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ বা বাঙালিরা সংকর জাতি
- ☑ মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি : ১৯৪৭-১৯৭০
  - ⊙ ভাষা আন্দোলন
  - ⊙ ছয়দফা আন্দোলন
  - ⊙ ৬৯'এর গণ-অভ্যুত্থান
  - ⊙ ৭০'এর নির্বাচন

BCS Syllabus

- History and culture of Bangladesh from ancient to recent times.
- **The Liberation War and its Background:** Language Movement 1952, 1954 Election, Six-Point Movement, 1966, Mass Upsurge 1968-69, General Elections 1970

আলোচ্য বিষয়

- বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদ
- মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি : ১৯৪৭-১৯৭০

BCS প্রশ্নাবলী বাংলাদেশের ইতিহাস

- ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমির বিভিন্ন পর্যায় উল্লেখ করুন। *[৪০তম বিসিএস]*
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিম্নের ঘটনাগুলোর প্রভাব বর্ণনা করুন: *[৪০তম বিসিএস]*
  (ক) ছয়-দফা আন্দোলন
  (খ) ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান
  (গ) ৭০-এর সাধারণ নির্বাচন
- ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্যায়গুলো আলোচনা করুন। *[৩৮তম বিসিএস]*
- টীকা লিখুন : ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন *[৩৭তম বিসিএস]*
- বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এর তাৎপর্য বর্ণনা করুন। *[৩৬তম বিসিএস]*
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে চীনা ও যুক্তরাষ্ট্রের বৈরী মনোভাবের কারণ কি ছিল? বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]*
- যুদ্ধাপরাধ কী? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য কয়টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যৌক্তিকতা বর্ণনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]*
- ১৯৪৭ সালের পর থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। *[৩২তম বিসিএস]*
- ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন বাঙালির সাংস্কৃতিক পুর্ণজাগরণ ও আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের বীজ বপনে কি ভূমিকা রেখেছিল? *[৩১তম বিসিএস]*
- ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করুন। *[২৭তম বিসিএস]*
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভাষা আন্দোলন ও ছয় দফা কর্মসূচির ভূমিকা আলোচনা করুন। *[১৮তম বিসিএস]*
- ছয় দফা আন্দোলনের পটভূমি ও এর গুরুত্ব আলোচনা করুন। *[১৩তম বিসিএস]*
- 'বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়' শিরোনামে একটি নিবন্ধন রচনা করুন। *[১১তম বিসিএস]*

যেভাবে প্রশ্ন হতে পারে

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমির বিভিন্ন পর্যায় উল্লেখ করুন।
২. 'বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়' শিরোনামে একটি নিবন্ধন রচনা করুন।
৩. ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪. বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা তুলে ধরুন।
৫. ভাষা আন্দোলন ও বাঙালি জাতীয়তাবোধ/ ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধের যোগসূত্র আলোচনা করুন।
৬. পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৭. ছয় দফা আন্দোলনের পটভূমি ও এ আন্দোলনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৮. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার তাৎপর্য পর্যালোচনা করুন।
৯. বাংলাদেশের মহান বিজয় অর্জনের পিছনে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
১০. বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিসৌধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী?

STUDENT STUDY বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ

জাতীয়তাবাদ একটি অনুভূতি বা অনুপ্রেরণা মাত্র। বিশ্বের প্রত্যেকের মধ্যেই এ অনুভূতি বা অনুপ্রেরণা বিদ্যমান। অর্থাৎ বিশ্বের প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্ব-স্ব জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ এবং জাতীয়তাবাদের সাথে জাতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। জাতীয়তাবাদকে আধুনিক বিশ্বে রাজনীতির একটি অন্যতম প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি বলে গণ্য করা হয়। ষোল শতকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভেলী সর্বপ্রথম এ মতবাদ প্রকাশ করেন। অতঃপর বিভিন্ন পটভূমিকায় এ জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশ ঘটে।

জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা : সাধারণত কোনো জনসমষ্টির নিজের ইচ্ছানুযায়ী জাতীয় জীবন গড়ে তোলার মানসিক অনুভূতি ও অনুরাগকেই জাতীয়তাবাদ বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো জাতি যখন স্বজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ-সংস্কৃতিতে ঐক্যবদ্ধ চেতনার প্রতিফলন ঘটায় তখন সে স্বজাত্যবোধ বা চেতনাকে জাতীয়তাবাদ বলা হয়। জাতীয়তাবাদ মানুষকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। এজন্য জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীদের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি : সাধারণত বংশগত ও ভাষাগত ঐক্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত ঐক্য, ভৌগোলিক নৈকট্য প্রভৃতি বিষয় জাতীয়তাবাদ উৎপত্তির মূল উপাদান। বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎপত্তির মূলেও উক্ত উপাদানগুলো পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন বংশের মানুষ একই জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বসবাস করায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ সুদৃঢ় হয়েছে। তাছাড়া একই ভাষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হওয়ায় বাঙালিদের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্যবোধও জাগ্রত হয়েছে। ভৌগোলিক ঐক্য বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একই খণ্ডের ভিতর বসবাস করার ফলে বাঙালিদের মধ্যে সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্যবোধ গড়ে উঠেছে। এভাবেই ক্রমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

➘ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ :

ভাষা-সংস্কৃতির ঐক্য বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হওয়ায় বাঙালিদের মধ্যে জাগ্রত হয় এক সুদৃঢ় ঐক্যবোধ। পাকিস্তান সৃষ্টির পর যখন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত আসে, ঠিক তখনই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। নিম্নে জাতীয়তাবাদের বিকাশের ধারাসমূহ আলোচনা করা হলো–

০১. **ভাষা আন্দোলন :** বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের সাথে বাংলা ভাষার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা ঘোষণা এবং বাংলার তরুণ সমাজ কর্তৃক এর প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের মধ্যে ঐক্যবোধের সূত্রপাত হয়। এ ঐক্যবোধের প্রেক্ষিতে পূর্ববাংলার জনগণ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলন বাঙালিদের ভাষাভিত্তিক সুপ্ত জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলে। ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের রক্তের বিনিময়ে জাতীয়তাবাদী দাবি আদায়ের শিক্ষা দেয়। সমগ্র জাতিই সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতে আরো প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলার সাহস ও অনুপ্রেরণা লাভ করে। এ আন্দোলন সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূর করে হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই বাঙালি চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ করে। ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বাঙালিদের মধ্যে স্বাধিকার অর্জনের আকাঙ্খা তীব্র হয়। এখান থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের যাত্রা শুরু।

০২. **১৯৫৪ সালের নির্বাচন :** ১৯৫৪ সালের মার্চে পূর্ববাংলার আইনসভার নির্বাচনের ফলে বাঙালি জাতীয়বোধ আরো জোরদার হয়। এ নির্বাচনে কেন্দ্রের বিমাতাসুলভ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিদের বিরোধীতার প্রকাশ ঘটে। তারা তাদের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের দাবির প্রতি ঐক্যবদ্ধভাবে সমর্থন জানায়।

০৩. **১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন :** ১৯৫৮ সালে গঠিত এস.এম শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বের হলে দেখা যায় এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করাসহ কতিপয় কালাকানুন সংযোজিত হয়েছে। বাংলার ছাত্রসমাজ তথা গোটা পূর্ব পাকিস্তানবাসী হামিদুর রহমানের শিক্ষানীতি সঙ্গত কারণেই মেনে নিতে পারে নি। বরং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে একে প্রতিহত করার প্রয়াস পায় যা ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন নামে পরিচিত।

০৪. **ছয় দফা আন্দোলন :** পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্লজ্জ শোষণ-পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে বাঙালিরা একান্তভাবে স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং এর প্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সালে নিজেদের স্বায়ত্তশাসন আদায়ের লক্ষ্যে ছয় দফা দাবি পেশ করে যা বাঙালিদের কাছে 'মুক্তিরসনদ' হিসেবে পরিগণিত। ছয় দফা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আরো জোরদার করে। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালিদের জাতীয় চেতনাবোধ ও মনোবল আরো সুদৃঢ় হয়।

০৫. **৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান ও ৭০ সালে নির্বাচন:** ৬৮-এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পরবর্তী ৬৯-এর ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান এবং ৭০ সালের সাধারণ নির্বাচেন আওয়ামী লীগের জয়লাভের পেছনে প্রেরণা ও শক্তি যুগিয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা। ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ।

০৬. **৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ :** ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল ভাষা সংগ্রামের মধ্য গিয়ে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতির কাছে প্রত্যাশার চূড়ান্ত প্রাপ্তি। সে কারণে বাঙালি জাতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কবল থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। আর এতে প্রেরণা যুগিয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাংলার বীর জনতা ঐক্যবদ্ধভাবে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে ১৬ ডিসেম্বর' ১৯৭১ সালে হানাদার বর্বর পাকিস্তান বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। যা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ।

অষ্টম শতক থেকে বৈষ্ণব ধর্মের সম্প্রসারণ ঘটে। গুপ্ত যুগে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলন ছিল। পাল রাজাদের আমলে বৌদ্ধ ধর্ম পুনরায় ব্যাপকতা লাভ করে। পাল যুগের পর এদের বৌদ্ধ ধর্ম সহজিয়া ধর্মরূপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সহজিয়া ধর্মমতের আচার্যগণ সিদ্ধাচার্য নামে পরিচিত। সেন রাজাদের আমলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম প্রবল রূপ ধারণ করে। তবে হিন্দু নামে এক জাতির পরিচয় বিধৃত হয় মুসলিম শাসনামলে। পরবর্তীকালে মুসলমানদের আগমনের সাথে সাথে এদেশে ইসলাম ধর্মের সম্প্রসারণ ঘটে। পর্তুগীজ ও ইংরেজ আগমনে এদেশে প্রচলিত হয় খ্রীষ্টধর্ম। এভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মমতের জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যে আছে তার বিচিত্র প্রতিফলন। বাংলার প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে বাঙালির উন্নত নৈতিক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন সাহিত্যে ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্রও আছে। দোষ ত্রুটি থাক সত্ত্বেও চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বাঙালির উদ্যমশীলতা, সাহসিকতা ও বিদ্যোৎসাহিতার প্রশংসা করেছেন।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছিল প্রাক-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এ জাতীয়তাবাদ হঠাৎ করে বিকশিত হয়নি। এর বিকাশের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস বর্তমান। বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে উন্মেষ ঘটে, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। উপসংহারে বলা যায় যে, বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতির আগমনে এ সংকর জাতির সৃষ্টি হয়েছে, আর এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তির মূল সূত্র। বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে প্রাচীন ও নব্য প্রস্তর যুগের এবং তাম্রযুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে বলে ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করেছেন। এ সকল যুগের বাংলার পার্বত্য সীমান্ত অঞ্চলেই মানুষ বাস করত এবং ক্রমে তারা অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে।

ব্রিটিশ ভারত ও বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাঙালি জাতীয়তাবাদের পূর্ণতা পায় যে মহান মানুষটির হাত ধরে তিনি হলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমান। তিনি না থাকলে বাংলাদেশ হতো না যেমন সত্য, তেমনই বাঙালি জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা পেত না এটাও সত্য।

➘ বঙ্গবন্ধু এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ

বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের যে কয়টি ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন অতি গুরুত্বপূর্ণ। শেখ মুজিবুর রহমান তখন তরুণ নেতা। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল বিজয় অর্জন করে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সারা বাংলাদেশে জনসংযোগ করেন। তিনি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের চেতনায় ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। ফলে নির্বাচনে যক্তু ফ্রন্ট বিপুল বিজয় অর্জন করে। তিনি বাংলার মানুষকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। ফলে জনগণের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রবল হতে থাকে। শেখ মুজিবুর রহমানের অমায়িক আচরণ, প্রবাদতুল্য স্মৃতিশক্তি এবং সম্মোহনী বক্তব্য মানুষকে আকর্ষণ করতো। আস্থা অর্জনের মাধ্যমে তিনি মানুষকে সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের অরক্ষিত অবস্থা এবং অন্যান্য বৈষম্যমূলক আচরণ বঙ্গবন্ধুকে চরমভাবে নাড়া দেয়। এর প্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি লাহোরে জাতীয় সম্মেলনে ৬ দফা দাবি উত্থাপনের লক্ষ্যে আলোচ্যসূচিতে অন্তভর্ক্ত করার দাবি জানান। কিন্তু সম্মেলনের উদ্যোক্তারা বঙ্গবন্ধুর এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধুউক্ত সম্মেলন বর্জন করেন। ছয়দফার মূল বক্তব্য তিনি গণমাধ্যমে প্রকাশ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রপত্রিকায় বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমানের নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি: ৬ দফা কর্মসূচি' শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এই কর্মসূচি ঘোষণার ফলে আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধুকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে এবং ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলার প্রধান আসামি হিসেবে দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালে তাঁর বিচার কার্যক্রম শুরু করে। এ ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা আরো প্রবল হয়ে উঠে। ১৯৬৯ সালে তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র-জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান ঘোষণা করেন, পরবর্তী নির্বাচনে তিনি আর প্রেসিডেন্ট হিসেবে অংশ নিবেন না। বঙ্গবন্ধু এবং অন্য ৩৪ আসামিকে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের এক বিশাল সমাবেশ থেকে তাঁকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা। সবার আস্থা ও ঐক্যের প্রতীক।

১৯৭০ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রলয়ংকরী ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত করে। দুর্যোগে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ মারা যায় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুহারা হয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তখন অসহায় মানুষের দিকে নজর না দিয়ে নিজেদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অন্যদিকে, বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমান দুর্যোগ-দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ফলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় অর্জন করে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ টি আসনের মধ্যে ২৮৮ টিতে জয় লাভ করে এবং জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তান অংশের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসনে জয় লাভ করে। মূলত বঙ্গবন্ধুর ভূমিকার কারণে এদেশের জনগণ বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ভরাডুবি নিশ্চিত করে।

নির্বাচনে জয়লাভ করলেও বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতায় বসতে দেওয়া হয়নি। বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণই মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদের মুক্তির সনদ যা প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ডাক। এ ভাষণের গুরুত্ব ও প্রভাব বিবেচনা করে ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে "বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল" বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। ঐদিনের ভাষণে বাঙালি জাতি উপলব্ধি করেছিল, যুদ্ধের মাধ্যমেই চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে হবে।

২৫ মার্চ কালরাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধুদৃঢ়চিত্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে সাধারণ মানুষ দেশের জন্য পরিবার পরিজন ছেড়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রাণপণ যুদ্ধ করে বীর মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশ স্বাধীন করেন। এ যুদ্ধ বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে, বঙ্গবন্ধু নামে এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়েই সবাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এটিই জাতীয়বাদ বিকাশের সর্বোচ্চ শিখর। এখানে বঙ্গবন্ধুই মূল চরিত্র।

STUDENT STUDY

বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদ

ব্রিটিশ ভারত ও বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯০৫ সালে ভারতের তৎকালীন বড় লাট লর্ড জর্জ নাথানিয়েল কার্জন (লর্ড কার্জন নামে পরিচিত) বাংলা প্রদেশ ত্যাগ করেন, যা ইতিহাসে 'বঙ্গভঙ্গ' নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে একই বছর ১৬ অক্টোবর অবিভক্ত বাংলার ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও মালদা জেলা চিফ কমিশনার শাসিত আসামের সঙ্গে সংযুক্ত করে পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়, যদিও মাত্র ৬ বছরের মধ্যে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। ১৯০৫-১৯১১ সাল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস ঘটনাবহুল। বঙ্গভঙ্গ ও রদকে কেন্দ্র করে বাংলার প্রধান দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের এতো দিনের গড়ে ওঠা ঐক্যের বিপরীতে অনৈক্যের সূত্রপাত ঘটে। বাংলার রাজনীতিতে এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এর ফলে ভারত উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণের সূচনা হয়। বঙ্গভঙ্গের তাৎক্ষণিক ফল ১৯০৬ সালে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী পৃথক দল মুসলিম লীগ গঠন। এ দল যে কোনো মূল্যে বঙ্গভঙ্গ বলবৎ রাখার পক্ষে ছিল। অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় অংশ জাতীয় কংগ্রেসের সহযোগিতায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের ওপর বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য চাপ অব্যাহত রাখে। এ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকারের ১৯০৯ সালে মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের দাবীকে স্বীকৃতি দিয়ে রাজনীতিতে নতুন ধারার সূচনা ঘটায়। দু'বছর পর ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করে হিন্দু নেতৃবৃন্দকে সন্তুষ্ট করে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ী সংঘাতের সৃষ্টি করে। এরপর সাময়িকভাবে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা চললেও ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি পর্যন্ত দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম বৈরী সম্পর্ক বিরাজ করে।

➘ বঙ্গভঙ্গের পটভূমি

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের সময় বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হলেও এর বহু আগে, বলতে গেলে বাংলা প্রদেশ গঠনের পর থেকেই সরকারিভাবে বাংলার বিভক্তি নিয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা উত্থাপিত হয়। হেনরি কটনও মনে করেন- বঙ্গভঙ্গ অনেক দিনের আলোচনা ও পর্যালোচনার ফল। লর্ড কার্জনকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলেন তিন জন ব্রিটিশ আমলা বাংলার ছোট লাট অ্যান্ড্রু ফেজার, আসামের চিফ কমিশনার (পরে পূর্ব বাংলার ও আসামের প্রথম ছোট লাট) ব্যামফিল্ড ফুলার এবং ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব হার্বার্ট রিজলে।

১৮৫৪ সালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম নিয়ে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে বাংলা প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়। অমলেন্দু ত্রিপাঠীর মতে, পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ বাদ দিয়ে সমস্ত ভারত ছিল বাংলার অন্তর্ভুক্ত। ভারতের দি ফাস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট (১৮৫৫-১৮৫৬) বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন দেখানো হয় ২ লক্ষ ৫৩ হাজার বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৪ কোটি। স্বয়ং লর্ড ডালহৌসি তখন স্বীকার করেন একজন শাসকের পক্ষে এতো বড় একটি প্রদেশ শাসন করা রীতিমত কষ্টকর। বঙ্গভঙ্গের পেছনে নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলো ভূমিকা রাখে–

০১. **হেনরি নর্থকোর্টের সুপারিশ- ১৮৬৭ :** ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সরকারের ব্যর্থতা অনুসন্ধানের জন্য ভারত সচিব স্যার স্ট্যামফোর্ড হেনরি নর্থকোট ১৮৬৭ সালে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বাংলা প্রদেশের প্রশাসনিক অসুবিধাকে দুর্ভিক্ষের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে বাংলা বিভক্তির সুপারিশ করেন। এরপর ১৮৬৭ সালে বাংলার ছোট লাট উইলিয়াম গ্রে আবারো প্রদেশ বিভক্তির সুপারিশ করেন। তিনি একই সঙ্গে বোম্বাই ও মাদ্রাজের মতো বাংলার দায়িত্বও একজন লেফটেন্যান্ট গর্ভনরের হাতে ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব করেন।

০২. **লরেন্স প্রস্তাব :** তখনকার বড় লাট লরেন্স এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বাংলার কিছু অংশ যেমন, আসাম ও তৎসংলগ্ন জেলাগুলোকে বিচ্ছিন্ন করার বিকল্প প্রস্তাব দেন। সে মুহূর্তে বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলা থেকে আলাদা করার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেননি। তা সত্ত্বেও প্রশাসনিক প্রয়োজনে বাংলার আয়তন ছোট করার পরিকল্পনা শাসক মহলের ভাবনায় বিশেষ স্থান পায়।

০৩. **ক্যাম্বেল প্রস্তাব :** ১৮৭২ সালে ভারতের প্রথম আদমশুমারিতে দেখা যায় যে, বাংলা প্রেসিডেন্সির জনসংখ্যা ৬ কোটি ৭০ লক্ষ। এর পরিপ্রেক্ষিতে ছোট লাট ক্যাম্বেল পুনরায় প্রশাসনিক অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতে ১৮৭৪ সালে আসামকে বাংলা ভাষী তিনটি জেলা সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া চিপ কমিশনারের অধীনে এনে বাংলা থেকে পৃথক করা হয়। যদিও বাংলার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা রোধে এ ব্যবস্থা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়। তা সত্ত্বেও এ পরিকল্পনাকে বঙ্গভঙ্গের প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়।

০৪. **ওয়ার্ড পরিকল্পনা- ১৮৯৬ :** ১৮৯৬ সালে আসামের চিফ কমিশনার উইলয়াম ওয়ার্ড ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জেলাকে আসামের অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব করেন।

০৫. **কটন পরিকল্পনা :** ওয়ার্ডের উত্তরাধিকারী হেনরি কটন এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি এর প্রধান দু'টি কারণ উল্লেখ করেন। **প্রথমত,** চট্টগ্রামকে অনুন্নত আসামের সাথে সংযুক্ত করে কোনো লাভ হবে না। **দ্বিতীয়,** এতে গণ-অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। এর পর পর চট্টগ্রামবাসী, ব্যবসায়ী শ্রেণি এবং বাংলার আইন পরিষদের সদস্যদের বিরোধিতার কারণে উইলিয়াম ওয়ার্ডের পরিকল্পনা নাকচ হয়ে যায়।

০৬. **কার্জনের দায়িত্বভার গ্রহণ এবং বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার গতি লাভ :** এভাবে সর্বশেষ যখন চট্টগ্রাম জেলা ও সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ বাংলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভূক্ত রাখা হবে না, বরং আসামের আয়তন বৃদ্ধি করা হবে এ বিতর্ক চলছিল তখনই ১৮৯৮ সালে লর্ড কার্জন

ভারতবর্ষের বড় লাট হয়ে আসেন। লর্ড কার্জন এ সকল পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর বাস্তবায়নও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায়।

০৭. **অ্যান্ড্রু ফ্রেজার পরিকল্পনা- ১৯০১ :** মধ্য প্রদেশের চিফ কমিশনার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার ১৯০১ সালে উড়িয়া ভাষাভাষী অঞ্চলের পুনর্গঠনের জন্য প্রস্তাব করেন এবং এর উপর লর্ড হেমিলটনের সঙ্গে চিঠি বিনিময় করেন। অ্যান্ড্রু ফ্রেজার শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বাংলা প্রদেশ বিভাগের সুপারিশ এবং এর পক্ষে রাজনৈতিক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি এতে উল্লেখ করেন যে, যদি ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসামের অন্তর্ভূক্ত করা হয় তা হলে এ অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থার সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে।

০৮. **রিজলে পরিকল্পনা- ১৯০৩ :** লর্ড কার্জন বিষয়টি গুরুত্বসহ বিবেচনা করেন এবং ১৯০২ সালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাথে বাংলা প্রদেশের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করার বিষয়টি পুনরায় বিবেচনা করতে ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করেন। এ নির্দেশকে কার্যকর করতে ১৯০৩ সালের ১২ ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্র সচিব হাবার্ট রিজলে চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের সঙ্গে সংযুক্ত করে চিফ কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত করার প্রস্তাব পেশ করেন। এই পরিকল্পনাটি "Risley Note" বা রিজলে পত্র নামে পরিচিত। কেন্দ্রীয় সরকার সীমানা রদবদলের পর তা অনুমোদন করে। এ পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হলে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনা ও অসন্তোষ দেখা দেয়। বিভিন্ন মহল থেকে এর বিরুদ্ধে সরকারের কাছে স্মারকলিপি আসতে থাকে। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে ১৯০৩-০৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫০০ সভা সমাবেশ হয়। শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। কংগ্রেসের অধিবেশনে রিজলের পরিকল্পনাকে 'জঘন্য' আখ্যা দেয়া হয়। অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রতিবাদ জানিয়ে মন্তব্য করা হায় যে, ব্রিটিশ সরকার দু'টি প্রশাসনিক বিভাগের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে দুর্বল করতে চায়। পূর্ব বাংলা থেকে প্রকাশিত ঢাকা প্রকাশ একই মন্তব্য করে। এমন কি মুসলমানদের পক্ষ থেকেও এর প্রতিবাদ আসে। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ভাইসরয়ের নির্বাহী পরিষদের সদস্য ইবেৎসন এসব প্রতিবাদের জবাবে সরকারকে পরিষ্কার জানিয়ে দেন, "বিভিন্ন সংস্থা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা প্রশাসনিক স্বার্থ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসনিক প্রয়োজনে সকল স্তরের বিরোধিতা সত্ত্বেও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়া উচিৎ।" লর্ড কার্জনও এ পরামর্শ মেনে নেন এবং পূর্ব বাংলার জনমতকে পক্ষে টানতে ১৯০৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলা সফরের ঘোষণা দেন।

০৯. **লর্ড কার্জনের পূর্ব বাংলা সফর:** পূর্ব বাংলা সফরকালে লর্ড কার্জন ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রামে বক্তৃতা দেন এবং এখানে তিনি প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যাসে আরো কিছু এলাকা যুক্ত করার ইঙ্গিত দেন। যার ফলে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর, একটি আইন পরিষদ ও পৃথক রাজস্ব বোর্ড নতুন প্রশাসনিক এলাকার মধ্যে থাকবে। তিনি মুসলমানদের পক্ষে টানার জন্য ১৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকাতে বক্তৃতায় বলেন, "পূর্ববঙ্গের মুসলিম জনগণ প্রাচীন সুলতান-সুবেদারদের আমল থেকেই রাজনৈতিক ঐক্য থেকে বঞ্চিত; সে ঐক্য তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে।" গভর্নর নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকা করার এবং এ অঞ্চলের মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন। এরপর কার্জন প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি পুনরায় পর্যালোচনা করেন এবং কিছু সংযোজনসহ ১৯০৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি অনুমোদনের জন্য ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করেন। ৯ জুন ভারত সচিব ব্রডারিক এ পরিকল্পনা অনুমোদন করেন এবং তা ১৯০৫ সালের ১০ জুলাই প্রকাশিত হয়।

➘ বঙ্গভঙ্গের কারণ

বঙ্গভঙ্গের কারণ বিশ্লেষণে ঐতিহাসিকরা দুটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন কর্তাব্যক্তিরা প্রশাসনিক কারণকে বঙ্গভঙ্গের মুখ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। ম্যাকলে, রিজলে, ইবেৎসেন, ফ্রেজার, গডলেক এবং লর্ড কার্জনসহ ব্রিটিশ কর্মকর্তারা মনে করেন প্রশাসনিক প্রয়োজনে বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি ঐতিহাসিক ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের বড় অংশই মনে করেন বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। অমলেশ ত্রিপাঠী, সুমিত সরকার প্রমুখ ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে সেই মতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অবশ্য বঙ্গভঙ্গের পিছনে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কারণও বিদ্যমান ছিল।

➘ প্রশাসনিক কারণ

গোড়া থেকেই প্রশাসনিক কারণকেই বঙ্গভঙ্গের কারণ হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। লর্ড কার্জন বার বার একে প্রথম শ্রেণির প্রশাসনিক সংস্কার দাবি করেন। জে. আর. ম্যাকলে জোর দিয়ে বলেছেন বঙ্গভঙ্গের পেছনে শাসনতান্ত্রিক সুবিধার বিষয়টি ছিল মুখ্য। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ

মনে করেন যে, বাংলা একটি বিশাল প্রদেশ। বিভক্তির আগে বিহার, ছোট নাগপুর, উড়িষ্যা নিয়ে বাংলা প্রেসিডেন্সি গঠিত ছিল। এটি আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বড় প্রদেশ। এর আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল এবং ১৯০১ সালের আদমশুমারী অনুসারে এর জনসংখ্যা ছিল ৪৮.৫০ মিলিয়ন এবং মাদ্রাজ প্রদেশের ৪২.৫০ মিলিয়ন। ফলে একজন গভর্নরের পক্ষে বিশাল প্রদেশের শাসন পরিচালনা দুরূহ হয়ে পড়ে। বাংলা নিযুক্ত কর্মকর্তারা এই অসুবিধার কথা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বার বার তুলে ধরেন। এ কারণে লর্ড কার্জন দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রশাসনিক সুবিধা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বঙ্গবঙ্গের পক্ষে কাজ শুরু করেন। এর পেছনে বেশ কিছু বাস্তবতা ভূমিকা রাখে। যেমন–

প্রথমত, পূর্ব বাংলা ভারতবর্ষের একটি পশ্চাদপদ প্রদেশে পরিণত হয় আঠারো শতকের মাঝামাঝি। মুর্শিদকুলী খান আঠারো শতকের প্রথম দিকে ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। ফলে ভূস্বামী, ব্যবসায়ী ও রাজধানীর উপর নির্ভরশীল গোষ্ঠী ঢাকা ছেড়ে সেখানে চলে যান। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর মুর্শিদাবাদ থেকে শাসনযন্ত্র কলকাতায় স্থানান্তর হয়। স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব বাংলা অবহেলিত থেকে যায়। এছাড়া পূর্ব বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যাতায়াত সমস্যা ও প্রদেশের অন্তর্গত প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি হওয়ায় পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত থাকে। ফলে পূর্ব বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থা দুর্বল, অদক্ষ ছিল। প্রশাসন কার্যকর ও সক্রিয় ছিল না। জনকল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য যে অর্থ এ এলাকায় ব্যয় করা হতো তা ছিল বাস্তব প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

দ্বিতীয়ত, পূর্ব বাংলার যোগাযোগ, পুলিশ ও ডাক ব্যবস্থা অত্যন্ত সনাতন প্রকৃতির ছিল। অনুন্নত যোগাযোগ এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ চর ও হাওড় অঞ্চল এবং দ্বীপগুলোতে প্রতিনিয়ত চুরি, ডাকাতি ও বেআইনী কাজ হতো। মানুষের নিরাপত্তা হতো হুমকির সম্মুখীন তাই বঙ্গভঙ্গে প্রদেশের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাও প্রাধান্য পায়।

তৃতীয়ত, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব রিজলে'র ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে লিখিত একটি চিঠি থেকে বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক কারণ সম্পর্কে জানা যায়। তিনি বলেন, বাংলা সরকারকে বিরাট প্রদেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব ছাড়াও রাজস্ব আদায়, ক্রমবর্ধমান জনসখ্যা, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রসার এবং আরো অনেক জটিল সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। এ সমস্ত দায়িত্ব সূচারুরূপে সম্পাদনের জন্য বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের দায়িত্ব লাঘব অত্যাবশ্যক ছিল। রিজলে ভৌগোলিক সীমারেখার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রশাসনিক উন্নতির জন্য এ সমস্ত পরিবর্তন যে যুক্তিসঙ্গত সে বিষয়টি উল্লেখ করেন।

লর্ড কার্জন দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে নিজেও উপলব্ধি করেন নতুন প্রদেশ গঠিত হলে বাংলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব হবে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি এগিয়ে যান।

➘ রাজনৈতিক কারণ

বেশিরভাগ ভারতীয় ঐতিহাসিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে বঙ্গভঙ্গের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। সুমিত সরকারের মতে, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নথিপত্র এবং প্রশাসকদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, ব্রিটিশ শাসকরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অমলেশ ত্রিপাঠী একই সুরে বলেছেন, একদিকে বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করার প্রয়াস এবং অন্য দিকে বাঙালি জাতির প্রতি অবিমিশ্রিত ঘৃণা থেকেই কার্জন বঙ্গভঙ্গের মতো কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এদিকটা ব্রিটিশ কর্মকর্তারা গোপন রাখার চেষ্টা করেন। যদিও তাদের বিভিন্ন সময়ের বক্তব্যে তা পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। এমনকি লর্ড কার্জনের উত্তরসূরি লর্ড মিন্টো যিনি কার্জনের নীতির ঘোরতর সমালোচক ছিলেন তিনিও স্বীকার করেছেন, "From a political point of view alone, I believe partition to have been very necessary," অবশ্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কয়েকটি লক্ষ্য ছিল। যেমন–

০১. **বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা ধ্বংস করা :** ব্রিটিশ শাসিত ভারতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে বিশ শতক শুরু হয়। সম্ভাবনাকে নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত অশুভ বলে চিহ্নিত করেন। এসময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতা। এর নেতৃত্ব ছিলেন হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃবৃন্দ। তাই বাংলাকে বিভক্ত করে বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করতে পারলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে বলে ব্রিটিশ আমলারা মনে করতেন। অ্যান্ড্রু ফ্রেজার ১৯০৩ সালের ২৮ মার্চ একটি চিঠিতে প্রথম এ বিষয় মন্তব্য করেন যার থেকে বঙ্গভঙ্গের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটি ফাঁস হয়ে যায়। ১৯০৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারী স্বরাষ্ট্র সচিব রিজলে আরো পরিস্কার মন্তব্য করে বলেন, "ঐক্যবদ্ধ বাংলা একটি শক্তি; বিভক্ত বাংলা তা নয়, আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য একে বিভক্ত করা এবং এভাবে আমাদের শাসনের বিরুদ্ধে বিরোধীদের দুর্বল করে তোলা।" যদিও কৌশলী কার্জন জনগনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে ধামাচাপা দিয়ে এ লক্ষ্য সফলের জন্য পুরো সময় কাজ করে যান।

শেষ পর্যন্ত কার্জনও বিষয়টিতে গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারেননি। তাঁর একটি মন্তব্য থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদিদের প্রতি ক্ষোভ ও ব্রিটিশ সরকারের কাছে বঙ্গভঙ্গের যৌক্তিকতা তুলে ধরে। তিনি বলেন, "বাঙালি বাবুরা চায় ইংরেজরা তাড়াতাড়ি গুটিয়ে চলে যাক যাতে লাট প্রাসাদে তারা অধিষ্ঠিত হতে পারে। আমরা যদি তাদের হট্টগোলের কাছে নতি স্বীকার করি তাহলে কোনো দিন

বাংলার আয়তন হ্রাস বা বঙ্গভঙ্গ করা যাবে না। এ পরিকল্পনা (বঙ্গভঙ্গ) গ্রহণ না করলে আপনি ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তে এমন একটি শক্তিকে সংহত সুদৃঢ় করবেন যা এখনই প্রচণ্ড এবং অদূর ভবিষ্যতে যা সুনিশ্চিতভাবেই ক্রমবর্ধমান অশান্তির উৎস হয়ে দাঁড়াবে।"

০২. **বাঙালি ভদ্রলোকদের একাধিপত্য ধ্বংস করা :** ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করেছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সমগ্র ভারতবাসী যুক্ত নয়। বরং বৃহৎ অংশ বাঙালি ভদ্রলোকেদের প্রতি ব্রিটিশরা বিক্ষুব্ধ ছিল। পূর্ব বাংলা ও আসামের দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ল্যান্সেলট হেয়ারের একটি মন্তব্য থেকেও সেটি স্পষ্ট হয়। তিনি (৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৬) বলেন, বাংলা ভাগ কার্যত বাঙালি ভদ্রলোকদের শ্রেণি শাসন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। এই ভদ্রলোকদের অধিকাংশই ছিল হিন্দুদের তিন উচ্চ জাতি- ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈশ্যের অন্তর্ভুক্ত জমিদার, মহাজন, পেশাদার এবং কেরানী শ্রেণির মানুষ। অন্য সব সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করে এরাই শিক্ষা ও চাকরি-বাকরি পুরোপুরি কুক্ষিগত করে নেয়। এ একাধিপত্যই ছিল তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। কাজেই এসব ভদ্রলোকদের ক্ষমতা খর্ব করার উপায় হলো অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিকাশকে উৎসাহিত করা। এক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের বিকাশকেও লক্ষ্যে রাখা হয়েছে।

০৩. **কংগ্রেসের শক্তি দুর্বল করা :** ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভারতবাসীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রথম থেকেই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব নিয়ে যখন ব্যাপক তৎপরতা চলছিল ঠিক সেই মুহূর্তে ১৯০৪ সালের কংগ্রেস অধিবেশন এর বিরূপ সমালোচনা করা হয়। পরিহাস করে কার্জন তখন মন্তব্য করেন, "কংগ্রেস ছাড়া এখন সবাই বঙ্গ বিভাগে রাজি। বঙ্গভঙ্গের ফলে ভবিষ্যতে (ভারতীয় রাজনীতিতে) বাংলার হ্রাসের আশংকাই কংগ্রেসের এই জাতীয় মনোভাবের কারণ।" কার্জন বিশ্বাস করতেন যে, "কলকাতার গুরুত্ব কমিয়ে কর্মকাণ্ডের বিকল্প কেন্দ্রগুলোকে উৎসাহ দিলেই কংগ্রেস দুর্বল হয়ে পড়বে।" লর্ড কার্জন এ বিষয়টা গোপন করেননি। ১৯০৫ সালের ২৪ মে তাঁর একটি মন্তব্যই এর সাক্ষ্য দেয়। তিনি বলেন, "the best guarntee of the political advantage of our proposal is its disliked by the party." অর্থাৎ, বাংলা ভাগ যে কংগ্রেসের অপছন্দের এটাই আমাদের বাংলা ভাগ প্রস্তাবের রাজনৈতিক সুবিধার সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা।

০৪. **বিভক্ত ও শাসন নীতি :** অনেক পণ্ডিত বঙ্গভঙ্গকে ব্রিটিশ সরকারের চিরাচরিত 'বিভক্ত ও শাসন নীতি'র (Divide and Rule Policy) বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করেন। তাই এ নীতির দ্বারা তারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে সুদৃঢ় করেছিল। বঙ্গভঙ্গও ছিল এই নীতির ধারাবাহিকতা। এর ফলে একদিকে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় জাতীয়তাবোধ জেগে উঠবে এবং তাদের খুশি করা যাবে। তারা সরকারের প্রতি আরো বেশি করে ঝুঁকে পড়বে। অন্যদিকে এ নীতি বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহ সৃষ্টি করে এতদিনের গড়ে ওঠা ঐক্য ও সংহতি নস্যাৎ করবে। পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বক্তৃতা থেকে এ বিষয় জানা যায়। ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকার এক জনসভায় লর্ড কার্জন বলেন, "ঢাকা এখন তার পূর্বের ছায়ামাত্র। বঙ্গভঙ্গ হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যা এসব জেলার জনগণকে তাদের সংখ্যাধিক্য ও উচ্চতর সংস্কৃতির বদৌলতে বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট জেলা সমূহে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম করবে এবং পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এমন ঐক্য গড়ে তুলবে, যা তারা প্রাচীন মুসলমান সুলতান ও সম্রাটদের আমলের পর কখনো অর্জন করতে পারেনি।" লর্ড কার্জনের এ ভাষণের সারকথা ছিল হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে মুসলিম মানুষ জাগিয়ে তোলা এবং কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু প্রধান পশ্চিম বাংলার বিপরীতে নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকাকেন্দ্রিক মুসলিম প্রধান পূর্ব বাংলাকে দাঁড় করানো।

➘ অর্থনৈতিক কারণ

০১. **অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা :** কলকাতা ছিল অবিভক্ত বাংলার প্রাণকেন্দ্র। ভারতবর্ষের রাজধানী হিসেবে কলকাতাকে কেন্দ্র করেই বাংলা প্রদেশের সকল প্রকার অর্থনৈতিক বিকাশ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ও প্রশাসনিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ১৯০৯ সালে পূর্ব বাংলা ও আসামের আইন পরিষদে বক্তৃতায় সদস্য সৈয়দ শামসুল হুদার বক্তব্যে উঠে আসে এ চিত্রটি। তিনি বলেন, "বাংলা বিভক্তির আগে বিরাট অংকের অর্থ কলকাতা ও তার আশে পাশের জেলাগুলোতে ব্যয় হতো, শ্রেষ্ঠ কলেজ, হাসপাতাল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ভারতের রাজধানীর আশেপাশে করা হতো। আর পূর্ব বাংলার মানুষ পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে বছরের পর বছর পুঞ্জিভূত অবহেলা ও বঞ্চনা।" বাঙালি এলিট শ্রেণিভূক্ত লোকদের কলকাতায় অবস্থান একে সর্বভারতীয় মিলনস্থল হিসেবে গড়ে তোলে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব বাংলা হতে সরবরাহকৃত কাঁচামালের বদৌলতে কলকাতার বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। অন্যদিকে দীর্ঘদিনের অবহেলা, উদাসিনতা ও ফলপ্রসু প্রকল্পের অভাবে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যায়। ফলে এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অত্যন্ত আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

০২. **জমিদারদের অত্যাচার থেকে মুক্তি:** পূর্ব বাংলার অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। এখানে জমিদারি ব্যবস্থা থাকলেও জমিদাররা কলকাতায় অবস্থান করতেন। তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের নিযুক্ত লোকজন নিরীহ পূর্ব বাংলার কৃষকদের উপর শোষণ চালাতো। আর এর সুফল ভোগ করত কলকাতাবাসী জমিদারগণ। জমিদারদের আরাম-আয়াসের জন্য ব্যায়িত অর্থ সংগ্রহ করা হতো। পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের জীবনে যে কালো ছায়া দেখা দেয়, সেটাই অবহেলিত পূর্ব বাংলাবাসীদের বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে।

০৩. **পাটের ন্যায্য মূল্য লাভ :** পূর্ব বাংলার অর্থকরী ফসল পাট। কিন্তু পূর্ব বাংলায় পাটকল তৈরি না করে বেশির ভাগ কলকাতার হুগলি নদীর তীরে গড়ে তোলা হয়। এর ফলে পাটের প্রকৃত মূল্য থেকে যেমন পূর্ব বাংলা বঞ্চিত হয় তেমনি শিল্প কলকারখানা পূর্ব বাংলায় গড়ে না তোলায় বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়ে যায়।

০৪. **চাকরি লাভের আশা:** তৎকালে সরকারি চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের একচেটিয়া প্রাধান্য থাকায় পূর্ব বাংলার মুসলিম জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। অধ্যাপক রফিউদ্দিন আহমেদ তাঁর গবেষণায় চাকরির ক্ষেত্রে ১৮১৭ সালের একটি হিসেবে দেখিয়েছেন যে, বাংলায় মুসলমান কর্মচারী ছিল মোট চাকরিরতদের ৫.৯ শতাংশ। অন্যদিকে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪১ শতাংশ। এ হিসেব থেকে মুসলমানদের প্রতি সরকারি অবহেলার চিত্র ফুটে উঠে। ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে এবং নিজেদের আর্থিক উন্নতির আশায় তারা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আন্দোলনে যোগ দেন।

০৫. **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও বন্দর সুবিধা অর্জন:** পূর্ব বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল চরমভাবে অবহেলিত। চট্টগ্রাম বন্দরকে কেন্দ্র করে আসাম ও পূর্ব বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের যে প্রসার হতে পারতো সেদিকে সরকারের দৃষ্টি ছিল না। বাংলাদেশের বড় বড় নদীগুলোকে যেমন– মেঘনা নদীকে বড় জাহাজ চলাচলের জন্য ব্যবহার করা হয়নি। কলকাতার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম, ভারতের রেল যোগাযোগের উন্নতির জন্য উত্তর-পশ্চিম রেলপথ তৈরি করা হলেও পূর্ব বাংলার সঙ্গে রেলপথে যোগাযোগ ছিল অবহেলিত। ঢাকা বিভাগ থেকে গণপূর্ত কাজের জন্য ৬ লক্ষ টাকা তোলা হলেও তা ব্যয় করা হয়েছে কলকাতা, উড়িষ্যা ও বিহারে। বাণিজ্য কেন্দ্র ঢকা বিভাগের সঙ্গে চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিও করা হয়নি। চট্টগ্রামের উন্নতি হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে কলকাতার গুরুত্ব হ্রাস পাবে। এ আশংকায় কলকাতা কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দরের সম্প্রসারণে কোনো চেষ্টাই করেনি। বঙ্গভঙ্গের পেছনে কার্জন যে অর্থনৈতিক সুবিধার কথা উল্লেখ করেন তাতে আসামের চা বাগানের মালিক, তেল ও কয়লা শিল্পপতিদের কম খরচে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে সমুদ্রে বাণিজ্যের কথাও উল্লেখ করা হয়। উত্তর পূর্ব ভারতে অর্থনৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ আসাম-বাংলা রেলপথকে একটি প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে আনার বিষয়ও প্রাধান্য পায়। যদিও সুমিত সরকারের মতে, এসব যুক্তির মধ্যে ফাঁক ছিল। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে যে পূর্ব বাংলার উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে পূর্ব বাংলাবাসীদের অসন্তোষকে ঘনীভূত করেছে।

➘ সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ

ইংরেজ শাসনের শুরু থেকে তাদের বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে মুসলিম সমাজ ধীরে ধীরে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য হারাতে থাকে। ফলে ১৯০৫ সালে পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ তাদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের আশায় ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব জোরালোভাবে সমর্থন করে। তাছাড়া অনেক আগে থেকেই পূর্ব বাংলায় মুসলমান এবং পশ্চিম বাংলা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয় ছিল। স্বাভাবিকভাবেই, প্রত্যেকে তাদের স্বধর্মের মূল্যবোধ নিয়ে বেঁচে থাকতে চাইবে, সেজন্যে প্রয়োজন হয়ে পড়ে স্বাধীনতা তথা মুক্ত পরিবেশ। বলাবাহুল্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও পূর্ব বাংলার মুসলমানরা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে হিন্দু জমিদার ও প্রভাবশালীদের হাতে বাধাগ্রস্ত হতো। এজন্যে নতুন প্রদেশে নিজেদের জীবনদর্শন অনুযায়ী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের মধ্যে যে জাগরণ দেখা দেয়, তা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে জোরদার করে তোলে। এছাড়া অধিকার বঞ্চিত মুসলমানদের দাবি আদায়ের ব্যাপারে বিভিন্ন মনীষীর সোচ্চার আবেদন তাদেরকে আত্মসচেতন করে তোলে। ফলে পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গঠনের উদ্দেশ্যে গঠিত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এই এলাকার মুসলমানদের মধ্যে ক্রমে তীব্রতর হয়ে ওঠে।

➘ বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

লর্ড কার্জনের পরিকল্পনা অনুযায়ী আসাম, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী বিভাগ নিয়ে (দার্জিলিং বাদ দিয়ে, কিন্তু মালদহ ও পার্বত্য ত্রিপুরা জেলা অন্তর্ভুক্ত করে) 'পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ' গঠিত হয়। এই নতুন প্রদেশের আয়তন ১০৬৫০৪ বর্গমাইল ও জনসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ১০ লক্ষ। এর মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান এবং ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু। পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী করা হয় ঢাকা। এই প্রদেশের জন্য একজন ছোট লাট, একটা ব্যবস্থাপক পরিষদ ও একটি রাজস্ব বোর্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়। স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের প্রথম ছোট লাট (গভর্নর) নিযুক্ত হন। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় বাংলা প্রদেশ, যার রাজধানী কলকাতা। এর আয়তন ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৮০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লক্ষ। এর মধ্যে ৪ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু, ৯০ লক্ষ মুসলমান এবং বাকি অন্যান্য ধর্মালম্বী। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয়।

➘ বঙ্গভঙ্গের ফলাফল

১৯০৬ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসামের ইরা পত্রিকায় প্রদেশ প্রতিষ্ঠার ফলে ৮টি সুবিধার কথা উল্লেখ করে। এগুলো হচ্ছে– ১. ঢাকা নগরের পুনর্জন্ম ও চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি; ২. নদী ও খালগুলোর উন্নতি, রেল লাইনের সম্প্রসারণ এবং চট্টগ্রামের সঙ্গে এর সংযোগ স্থাপন; ৩. নতুন প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হওয়ার ফলে জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আকর্ষণ করার সুযোগ-সুবিধা; ৪. সুষ্ঠু শাসন ও জনসাধারণের জান মালের অধিকতর নিরাপত্তা; ৫. পূর্ব বাংলার শিক্ষিত ও সভ্য লোকদের

সংস্পর্শে আসায় অনুন্নত আসামের অধিবাসীদের উপকার; ৬. পূর্ব বাংলার জন্য কর্মদক্ষ পুলিশ বাহিনীর ব্যবস্থা; ৭. প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি; ৮. এক বছরের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যাচ্ছে যে, জনসাধারণ এখন প্রদেশের প্রধান কর্মকর্তার সংস্পর্শে আসতে পারে যা পূর্বে কখনো সম্ভব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত সুবিধাগুলো পূর্ব বাংলা লাভ করে। আরো কয়েক ভাগে আমরা বঙ্গভঙ্গের ফলফল বিচার করতে পারি।

➘ রাজনৈতিক ফল

প্রথমত, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও নতুন প্রদেশ গঠন পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ ও রাজনীতিতে প্রাণচঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। উন্নয়নের ছোঁয়া লাগে রাজধানী ঢাকায়। গড়ে ওঠে নতুন অফিস, সচিবালয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান। পূর্ব বাংলা ও আসামের প্রশাসনের প্রতিটি শাখায় নতুন প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। লর্ড কার্জনের মতে, "The New province advanced in education, in good government, in every mark of Prosperity." নতুন প্রদেশের অবকাঠামোতে ও বাস্তব উন্নতি হয়।

দ্বিতীয়ত, নবগঠিত প্রদেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ তীব্র হয়ে উঠে। এসময় প্রদেশের মুসলমান নেতৃবৃন্দ হিন্দুদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটি প্রতি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন স্তরের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার দিকে দৃষ্টি দেয়। বঙ্গভঙ্গের প্রথমবার্ষিকী মুসলমানরা পালন করে উৎসবমুখর চিত্তে। অন্যদিকে হিন্দুরা একে শোক ও বেদনার দিন হিসেবে পালন করে। এর ফলে সমাজে নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসের আবির্ভাব ঘটে। বেশ কিছু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় যাতে অনেক প্রাণহানি ঘটে।

তৃতীয়ত, মুসলমানদের নিজস্ব দল মুসলিম লীগ গঠন (১৯০৬) বঙ্গভঙ্গের অপর রাজনৈতিক ফল। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার ব্যাপক মানুষের সমর্থনে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহকে পূর্ব বাংলার নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে ব্রিটিশ শাসকদের জন্য উক্ত নবাবদের মাধ্যমে বাংলার জনসাধারণকে সাম্প্রদায়িকভাবে বিভক্ত করার উদ্যোগে সহজে সফল হয়। ঢাকার বিভেদ নীতিকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করতে এগিয়ে আসার মধ্য দিয়ে সারা ভারতবর্ষের মুসলমানদের ওপর তাদের নেতৃত্ব সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে কারণে মুসলিম লীগ গঠিত হয় নবাব সলিমুল্লাহর আহ্বানে এবং ঢাকায়। এ দলের চাপের কারণেই মর্লি-মিন্টো ১৯০৯ সালে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করেন।

➘ সামাজিক ফল

বঙ্গভঙ্গের আগে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হলেও তা ধীরে গতিতে হয়েছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ, পরের বছর মুসলিম লীগ গঠনের পর হিন্দুদের বিরোধিতার কারণে মুসলিম জাতীয়তাবাদা আরো চাঙ্গা হয়। ১৯০৫-১৯১১ সাল পর্যন্ত শিক্ষা, চাকরি কৃষি ক্ষেত্রে অগ্রগতির ফলে মুসলিম মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এতোদিন অভিজাত সম্প্রদায় থেকেই শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির ফলে গ্রামীণ উদ্বৃত্ত কৃষক পরিবারকে মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত করে। এরাই রাজনীতি, সমাজ ও শিক্ষা সাহিত্য চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

➘ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ফল

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রতিটি স্তরেই প্রাদেশিক সরকার সংস্কারের উদ্যোগ নেয় এবং উন্নয়ন সাধন করে। ১৯০৬ সালের মে মাসে প্রাদেশিক সরকার মুসলিম কর্মচারি সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নির্দেশ দেয় এবং পরে কোটা পদ্ধতি চালু করলে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার উৎসাহ আরো বৃদ্ধি পায়। ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১২ সালের ভেতর গোটা বাংলায় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা শতকরা ৩৭ ভাগ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ব বাংলায় বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৮২.৯ ভাগ যা সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বোচ্চ।

অন্যদিকে একটি হিসেব থেকে জানা যায় যে, ১৯০১-১৯০২ সালে বাংলায় মোট মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩,৩১,৯০০ জন, ১৯১১-১২ সালের মধ্যে এ সংখ্যা ৫,৭৫,৬৬৭ জনে উন্নীত হয়। নারী শিক্ষারও অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। ১৯০৮-০৯ সালে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৫৫০-এ এসে দাঁড়ায় এবং ছাত্রী সংখ্যা ১,৩২,২৩৯ জনে উন্নীত হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বিস্ময়কর উন্নতি পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের ফল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

➘ অর্থনৈতিক ফল

প্রথমত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফল ছিল আশাব্যঞ্জক। এসময় ব্যাপকভাবে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি এবং এর ফলে পাটের দামও বেড়ে যায়। ১৯০৬-১৯০৭ সালে পাটের দাম বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০৪ সালের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। এর ফলে পূর্ব বাংলার কৃষকদের হাতে বাড়তি আর্থ আসতে থাকে। সন্দেহাতীতভাবে কৃষকদের কাছে তা বঙ্গভঙ্গের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবেই ধরা পড়ে যা নতুন মধ্যবিত্ত

শ্রেণি গঠনে ভূমিকা রাখে। এভাবে উদ্বৃত্ত অর্থ এবং শিক্ষিত শ্রেণির নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগের কারণে কৃষক ও শিক্ষিত মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গকে আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়ত, ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ করে রফতানি বাণিজ্যে ব্যাপক উন্নতি হয়। এক হিসেবে দেখা যায় যে, প্রথম বছরে বৈদেশিক বাণিজ্য ২,৯৮,২৭,৩৯৭ থেকে ৩,১৭,৭৭,৮৪৬ টাকা উন্নীত হয়, যা পূর্বের চেয়ে ১৯,৫০,৪৪৯ টাকা বেশি। আমদানি ও রফতানি উভয় বাণিজ্যেই এ বৃদ্ধি ঘটে। প্রদেশের সমুদ্র নির্ভর বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯০৫-১৯০৬ অর্থ বছরে এই বন্দরের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩১৭.৭৬ লক্ষ টাকা।

তৃতীয়ত, প্রদেশের দুর্দশাগ্রস্ত পরিবহনের উন্নয়নের দিকেও নতুন প্রশাসন দৃষ্টি দেয়। যদিও এ খাতে অধিকাংশ ব্যয় ধরা হয় পূর্ব বাংলার চেয়ে পশ্চাদপদ আসামে। প্রদেশের রাস্তাঘাটের জন্য ১৯১১ সালে মাত্র ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

➘ বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া

০১. **মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু ও বর্ণ হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া :** ১৯০৩ সালের শেষ দিকে প্রথম বারের মতো বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার পর এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়। তবে বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন হলে হিন্দু সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কলকাতাকেন্দ্রিক সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু ও বর্ণ হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে। কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বিশেষ করে জমিদার, রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও সাংবাদিক সবাই এ আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান নেন। তারা বঙ্গভঙ্গকে বাঙালি বিরোধী, জাতীয়তাবাদ বিরোধী ও বঙ্গ মাতার অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি বিশেষণে আখ্যায়িত করেন। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মন্তব্য করেন, বাংলা বিভাগ করে হিন্দুদের অপমান ও অপদস্ত করা হয়েছে। তারা মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপাতিত্ব এবং মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বলে একে সাম্প্রদায়িক রূপ দেন। বর্ণ হিন্দুরা ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে কাশিমবাজারের জমিদার মহারাজা মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্ব এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। সভাস্থল ছাড়িয়ে লোক সমাগম নিকটস্থ ময়দান এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং পত্র-পত্রিকায় দাবী করা হয় এক লক্ষ লোক এতে অংশ নেয়। সভাপতির বক্তৃতায় মহারাজা বলেন, নতুন প্রদেশে মুসলমানরা হবে সংখ্যাগুরু আর বাঙালি হিন্দুরা হবে সংখ্যালঘু। ফলে আমরা নিজ দেশে হবো প্রবাসী। অন্যদিকে বুদ্ধিজীবীরা একে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর আঘাত বলে মনে করেন। রাজনীতিবিদদের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বে দেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, গঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দু ঘোষ, বিপিন চন্দ্র পাল, অশ্বিনী কুমার দত্ত প্রমুখ।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে উচ্চ বর্ণের হিন্দু ও বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের বিরোধিতার প্রধান কারণ ছিল স্বার্থগত। ঢাকায় নতুন প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হলে নতুন প্রদেশে শিল্পকারখানা গড়ে উঠবে, নতুন পুঁজিপতি শ্রেণির জন্ম হলে কলকাতাকেন্দ্রিক শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া ব্যবসার বিঘ্ন ঘটার আশংকায় তারা এর বিরুদ্ধে ছিলেন। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ক্যালকাটা বেলড জুট অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান মাইনিং অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি ব্যবসায়ী সংগঠন বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করে ও প্রতিবাদলিপি পাঠায়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, আইনজীবি, সাংবাদিকরাও অনুরূপ কারণে ছিলেন। বিশেষ করে আইনজীবীরা মনে করতেন ঢাকায় নতুন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের আইন ব্যবসায় ভাটা পড়বে। কারণ তাদের বেশির ভাগ মক্কেলই পূর্ব বাংলার।

০২. **কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া:** হিন্দু সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলে। প্রতিবাদ সভার প্রত্যেকটিতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অংশ নেন এবং বঙ্গ বিভক্তি বাতিলের দাবি জানান। কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক দল হওয়া সত্ত্বেও এ আন্দোলনে যোগ দেয়ায় অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কংগ্রেসের যে পরিচয় ছিল তা ক্রমশ লোপ পায়। যদিও বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসে বাংলা ভাষী হিন্দুদের মানসিকতাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহারের সুযোগ করে দেয় এবং একটি শক্তিশালী হিন্দু সংগঠনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার আগের বছর ১৯০৪ সালে মোম্বাই কংগ্রেস অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাকে বাঙালির জাতিসত্ত্বাকে খণ্ডিত করার পরিকল্পনা বলে অভিহিত করা হয়। আন্দোলন জোরদার করার জন্য বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার দু'মাস আগে ৭ আগষ্ট কলকাতার এক জনসভা থেকে কংগ্রেস স্বদেশী আন্দোলনের ডাক দেয়। কংগ্রেসী হিন্দুদের এই বিক্ষোভ শুরুতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলেও তা বঙ্গভঙ্গের সমর্থক বিরোধী আন্দোলন রূপান্তিরিত হয়।

০৩. **হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কর্মসূচি এবং হিন্দু-মুসলিম সংঘাতের সূত্রপাত:** ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার দিন হিন্দু সম্প্রদায় শোক দিবস পালন, অনশন, সব ধরনের কাজ বর্জন, খালি পায়ে হেঁটে গঙ্গাস্নানে যায়। এর আগে ২২ সেপ্টেম্বর বাঙালির ঐক্য ও ভ্রতৃত্বের প্রতীক 'রাখিবন্ধন' বা বাহুতে লাল ফিতা ধারণ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নতুন কর্মসূচীর নেতৃত্ব দেন। বাংলার হিন্দুরা প্রচার করতে থাকে যে, বঙ্গভঙ্গ অর্থ বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ এবং এটি দেবী কালীর প্রতি অপমানে শামিল। হিন্দু ধর্মে কালী মাতৃভূমির প্রতীক। তাই বঙ্গভঙ্গ বিরোধীরা 'বন্দেমাতরম'কে তাদের জাতীয় শ্লোগান ও জাতীয় সংগীতে রূপ দেয়।

আন্দোলনকারীরা মুসলিম বিদ্বেষমূলক এই সংগীতকে চালু এবং সভা সমিতিতে এ সংগীত ব্যাপক ব্যবহার করায় মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত লাগে। ফলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ক্রমে মুসলিম বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। বাংলা ও বাংলার বাইরে আন্দোলন ক্রমে মুসলিম বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এর ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতী হুমকীর সম্মুখীন হয়। কুমিল্লা, ঢাকা, ফরিদপুর, জামালপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, পাবনাসহ পূর্ব বাংলার বহু স্থানে ১৯০৬-১৯০৭ সালে দাঙ্গা হয়। এসব দাঙ্গায় বহু লোক হতাহত হয়। ১৯০৫ সারের অক্টোবর মাসে বঙ্গভঙ্গের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী কংগ্রেস ও হিন্দুরা শোক দিবস হিসেবে পালন করে।

০৪. **সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়া:** কলকাতার অধিকাংশ পত্র-পত্রিকার মালিক ছিলেন তখন মধ্যশ্রেণির বা জমিদার। তারা চিন্তা করেছিলেন নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে নতুন নতুন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হলে তাদের ব্যবসা ও প্রভাব ক্রমশ কমে যাবে। এ কারণে হিন্দু মালিকানাধীন পত্রিকাগুলো প্রথম থেকেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ভূমিকা পালন এবং ব্রিটিশ সরকারকে বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর পরিচালনায় বেঙ্গলি পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে এক 'গুরুতর জাতীয় বিপর্যয়' হিসেবে চিহ্নিত করে। কৃষ্ণকুমার মিত্রের সম্পাদিত সঞ্জীবনী পত্রিকা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বয়কটকে সমর্থন করে। হিতবাদী পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গের কঠোর সমালোচনা করা হয়। এছাড়া ভূপেন্দ্রনাথ দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'যুগান্তর' পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলে এবং স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন দেয়। মতিলাল ঘোষের অমৃতবাজার পত্রিকা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে খুবই সোচ্চার করে। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট টাউন হলের সভার পরের দিন ৮ আগস্ট পত্রিকাটিতে মন্তব্য করা হয় "The 7th of August was the birthday of Indian nationalism. Nationalism means two things the self consecration to the gospel of national freedom and practice of Independence. Boycott is the practice of Independence.'' ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সন্ধ্যা নামে একটি দৈনিক পত্রিকা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করতো। শহর, উপশহর, গ্রাম ও গঞ্জের স্বল্প শিক্ষিত মানুষের কাছে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

০৫. **স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত:** বঙ্গভঙ্গ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হওয়ার আগেই এর বিরুদ্ধে ব্যাপক কর্মসূচি দেয়া হয়। ১৯০৫ সালে ১৭ জুলাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'বয়কট' প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মাধ্যমে বিলেতি পণ্য বয়কট, বিলেতি পণ্যে অগ্নিসংযোগ ও ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন কর্মসূচি গৃহীত হয়। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতা টাউন হলে স্বদেশী আন্দোলন ঘোষণার মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন রূপ নেয়। স্বদেশী আন্দোলন হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। বাংলা ছাড়াও যুক্ত প্রদেশের ২৩টি জেলায়, মধ্য প্রদেশের ১৫০টি শহরে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ২৪টি শহরে, পাঞ্জাবের ২০টি জেলায় ও মাদ্রাজের ১৩টি এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে স্বদেশী আন্দোলনকে তাই কেউ কেউ 'বিপ্লব' বলে চিহ্নিত করেন। উইল ডুরান্ট বলেন, "It was in 1905, then: that the Indian Revolution began.'' এ আন্দোলনই পরের বছর (১৯০৬ স্বরাজ বা বিদেশী শাসনের অবসান একমাত্র দাবিতে পরিণত হয়। ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর বিপিন চন্দ্র পাল নির্দ্বিধায় বলেন, "Our ideal is full freedom, which means absence of all foreign control.'' মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং ১৯০৮ সালে মন্তব্য করেন, "বঙ্গভঙ্গের পরই ভারতের প্রকৃত জাগরণ ঘটেছে।" এই বঙ্গভঙ্গ ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করে ১৯০৬ সালে পূর্ব বাংলা আসাম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্ণর ফুলার পদত্যাগে বাধ্য হন।

০৬. **নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া :** উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সকলে বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতা করলেও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বিশেষ করে নমঃশূদ্ররা বঙ্গভঙ্গ স্বাগত জানায়। পূর্ব বাংলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নমঃশূদ্র ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলা ও আসামের নমঃশূদ্ররা ছিল বিশ লাখ। শেখর বন্দোপাধ্যায় উল্লেখ করেন যে, তখন ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রামে হিন্দুরা ছিল মোট জনসংখ্যার ৩২.৬২% এর মধ্যে নমঃশূদ্র ছিল ১৬.৫%। যশোর ও খুলনার মোট হিন্দু জনসংখ্যার ১৩.৭৮% ছিল নমঃশূদ্র। পূর্ব বাংলায় হিন্দু কৃষকদের শতকরা ৯০% ছিল নমঃশূদ্র। হিন্দু ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও কায়স্থদের ঘৃণার ফলে তারা ছিল অনগ্রসর। বর্ণ হিন্দুদের রাজনৈতিক অভিলাষের মধ্যে তারা কোনো স্বার্থ খুঁজে পায়নি, তাই তারা বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করে। বাখেরগঞ্জ ও ফরিদপুরের নমঃশূদ্ররা বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে তাদের জোরালো মতামত ব্যক্ত করে।

০৭. **মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া :** কিছু ব্যতিক্রমবাদে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সিংহভাগ ছিল বঙ্গভঙ্গের পক্ষে। ১৯০৩ সালের প্রস্তাবিত বঙ্গ বিভক্তিকে সবাই এমনকি মুসলমানরাও বিরোধীতা করেছিল। যদিও লর্ড কার্জনের ১৯০৪ সালে পূর্ব বাংলা সফর এবং সংশোধিত বিভক্তিকে পূর্ব বাংলার জনগণ স্বাগত জানায়। কতিপয় জমিদার ও আইনজীবী ছাড়া পূর্ব বাংলার বিশাল জনগোষ্ঠী যাদের সিংহভাগ মুসলমান তারা এর পক্ষে নেয়। ১৯০৫ সাল থেকেই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যখন প্রবল আন্দোলন শুরু হয় তখন ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মুসলিম জনমত গঠনে ভূমিকা রাখেন। ১৯০৬ সালে তাঁর উদ্যোগে গঠিত হয় 'মুসলিম লীগ' নামে মুসলমানদের রাজনৈতিক দল। এ দলটি জন্মলগ্ন থেকেই বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন দেয়। নব গঠিত প্রদেশটি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের

সমর্থন লাভ করে। নতুন প্রদেশ গঠনের পর মুসলিম পত্র-পত্রিকা একে স্বাগত জানায় এছাড়া মোহামেডাম প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন নামে মুসলমান সংগঠনগুলোও একে সমর্থন দেয়। মুসলিম সাহিত্য সমিতি ১৯০৫ সালেই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। এই ঘোষণাপত্রে মুসলমানদের কাছে আবেদন জানানো হয় যে, তারা যেন স্বদেশী বা অন্য নামে বঙ্গবঙ্গ বিরোধী সভায় যোগ না দেন। এভাবে পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজে বঙ্গসভঙ্গ ব্যাপক প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

অবশ্য শিক্ষিত মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র অংশ বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে ছিলেন। তবে তাদের বেশির ভাগ কলকাতায় বসবাসকারী ভূ-স্বামী এবং কংগ্রেসপন্থী রাজনীতিবিদ। তাঁদের মধ্যে খাজা সলিমুল্লাহর সৎভাই খাজা আতিকুল্লাহ, ব্যারিষ্টার আবদুর রসুল, ইসমাইল চৌধুরী, লিয়াকত হোসেন, সৈয়দ খাজা আলাউদ্দিন, আব্দুল হালিম গজনবী, গোলাম মাওলা, কাজেম আহমেদ সিদ্দিকী, সৈয়দ মুহাম্মদ দিদার বক্স, সৈয়দ আহাম্মদ আকবর, আবুল কাশেম, আবুল হোসেন, মুহাম্মদ ইউসুফ, আলী মুজ্জামান চৌধুরী, লিয়াকত আলী, আবদুল গাফফার, আবুল হোসেন, দ্বীন মোহাম্মদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে ভূমিকা রাখেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সক্রিয় ছিল ভারতীয় মুসলমান সমিতি।

ঢাকার মুসলিম সমিতির অধিবেশনে সাহিত্যিক ইসমাইল হোসেন সিরাজী ঘোষণা করেন, "ভারতের হিন্দু মুসলমান এক বৃন্তে দুটি ফুল আমরা একই দেহের অঙ্গান্তর মাত্র।" কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা The Mussalman বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ভূমিকা রাখে। তবে সামাজিক মর্যাদা, সাংগঠনিক প্রতিভার দিক থেকে তাঁরা কেউ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে নেতা নবা সলিমুল্লাহ বা নবাব নওয়াব আলি চৌধুরীর সমকক্ষ ছিলেন না।

➘ বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১)

বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন তীব্র সন্ত্রাসবাদী রূপ নিলে ব্রিটিশ সরকার সমস্যার মুখোমুখি হয়। এছাড়া হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ব্রিটিশ সরকারকে ভাবিয়ে তোলে। বঙ্গবঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বাংলা থেকে ভারতে বহু স্থানে ছড়িয়ে পড়লে ব্রিটিশ সরকার নতুনভাবে এ বিষয়ে ভাবনায় পড়ে। ১৯১০ সালের নভেম্বর মাসে ভারতের শাসন বিভাগে দুটি পরিবর্তন দেখা দেয়। ভারত সচিব হয়ে আসেন লর্ড ক্রিউ এবং বড় লাট হন লর্ড হার্ডিঞ্জ। বড় লাট ঘোষণা করেন, ব্রিটিশ রাজ ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে এসে দিল্লিতে এক দরবার করবেন। সে জন্য কংগ্রেস নেতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি আপোস নীতি গ্রহণ করেন এবং বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন। ১৯১১ সালের ২৫ আগষ্ট বড় লাট ভারত সচিবের কাছে এক গোপন বার্তায় ভারতের প্রশাসনে কতিপয় পরিবর্তনের সুপারিশ করেন। এই পরিবর্তনর মধ্যে প্রথমত, ভারত সরকারের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়। এর সুবিধা হিসেবে বলা হয় যে, এর ফলে কলকাতা সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা পাবে। অন্যদিকে দিল্লিতে রাজধানী স্থনান্তর হলে উত্তর ভারতের মুসলমানরা খুশি হবে। কেননা দিল্লি এক সময় মোগল সম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। দ্বিতীয়ত, পরিবর্তন হিসেবে বলা হয় ৫টি বাংলা ভাষাভাষী বিভাগ যেমন- প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান, ঢাকা, রাজশাহী ও কুমিল্লাকে একত্রিত করে প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়। বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলাদেশ থেকে পৃথক করা হয়। নতুন প্রদেশের জনসংখ্যা হয় ৪ কোটি ২০ লক্ষ এবং আয়তন ৭০ হাজার বর্গমাইল। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গবঙ্গ রদ ঘোষণা করেন। নতুন ব্যবস্থা ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে কার্যকর হয়।

➘ বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ :

০১. **সংকীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদ:** বঙ্গভঙ্গের আগে থেকেই হিন্দুদের বড় অংশ বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতা করে। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে হিন্দু রাজনীতিবীদ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র মালিক শ্রেণি এর বিরোধীতা করেন। তারা বঙ্গভঙ্গকে মাতৃভূমি বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করে সংকীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদকে জাগিয়ে তোলে। এসব কর্মসূচি থাকার ফলে স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানদের অংশগ্রহণ বলতে গেলে তেমন কিছুই ছিল না। ফলে হিন্দু জাতীয়তাবাদ চেতনা ক্রমান্বয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ নেয়।

০২. **কংগ্রেস বিরোধীতা :** ভারতীয় কংগ্রেস প্রথম থেকেই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হওয়ার পর প্রত্যেকটি অধিবেশন ও জনসভায় দলটি বঙ্গবঙ্গ বিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করে। মূলত ১৯০৫ সালের ৭ আগষ্ট কংগ্রেস স্বদেশী আন্দোলনের ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে হিন্দুরা সর্বাত্মক আন্দোলনে অংশ নেয়। এই ইস্যুতে কংগ্রেস হিন্দুদের সমর্থকে পরিণত করে। এভাবে বঙ্গভঙ্গকে কংগ্রেস হীন রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে মুসলমানদের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। মুসলমানরা কংগ্রেস ও তার জাতীয়তাবাদী ঐক্যের আদর্শকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং অনেকে দল ত্যাগ করেন। তাসত্ত্বেও কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ভূমিকা এবং ব্রিটিশ সরকারকে তা রদের জন্য ভারতের নতুন বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে চরমপত্র দেন। হার্ডিঞ্জ এর পরেই বঙ্গভঙ্গ রদ চূড়ান্ত করেন।

০৩. **স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসী তৎপরতা :** বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার আগেই কংগ্রেসের নেতৃত্বে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ডাক দেয়। বিলেতি পণ্য বয়কটের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি ছিল বয়কট কর্মসূচির উদ্দেশ্য। এর ফলে বিলেতি কলকারখানা ও মিল ফ্যাক্টরিগুলোতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে ভাবতে থাকে। এমনকি ব্রিটিশ বণিকগণ সরকারের উপর বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। তবে স্বদেশী আন্দোলনের এক পর্যায়ে গঠিত গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির গঠনের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা, বিচারক ও ইংরেজ শাসকদের হত্যার চেষ্টা চালায়। ফিংসফোর্ড কে হত্যার দায়ে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীসহ অনেকের ফাঁসি হলেও এ কর্মসূচি অব্যাহত থাকে যা ব্রিটিশ সরকারকে বঙ্গভঙ্গ রদ নিয়ে ভাবতে অনুপ্রাণিত করে।

০৪. **ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ব:** তড়িৎগতিতে বঙ্গবঙ্গ চালুর পর ব্রিটেনে সরকারি মহলে মতদ্বৈততার শেষ ছিল না। সরকারের সঙ্গে অনেকটা মতদ্বৈততার কারণে ১৯০৫ সালের শেষ দিকে লর্ড কার্জনকে ভারত থেকে প্রত্যাহার করা হয়। নয় মাসের মাথায় পদত্যাগ করতে বাধ্য হন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের প্রথম গভর্নর বামফিল্ড ফুলার। অবশ্য বিপ্লবীদের প্রতি ফুলারের কঠোর নীতি যেমন- জনসভা ও শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ, বন্দেমাতরম শ্লোগানে নিষেধাজ্ঞা জারির কারণে তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে ভীষণ অজনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছিলেন। ফলে সরকারের সঙ্গে ফুলারের ব্যবধান বাড়তে থাকে। এমনকি ১৯০৬ সালের এপ্রিলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে তাঁর গৃহীত কার্যক্রম ভারত প্রত্যাখান করে।

বড় লাট লর্ড মিন্টো ফুলারের প্রতি কখনোই সন্তুষ্ট ছিলেন না যা তাঁর একটি মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন "Fuller, the Lieutenant Governor, though a pleasant man to talk to, does not all impress me as likely to take a level headed course of action, and there has been very stupid mismanagement there lately.'' ফুলারের স্থলাভিষিক্ত লেনসলট হেয়ার ছিলেন ফুলার বিদ্বেষী। কিন্তু বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর কঠোর নীতির কারণে তিনিও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অজনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। লর্ড মিন্টোর সঙ্গে তাঁরও মতদ্বৈততা শুরু হয় এবং ১৯০৮ সারে ভাইসরয় মিন্টো হেয়ার সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন। পদত্যাগের ২ বছর পর ১৯০৮ সালের ৬ জুন ফুলার Jaccuse ছদ্মনামে দি টাইমসে এক নিবন্ধে লেখেন যে- ব্রিটিশ সরকার নতুন প্রদেশের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। মূলত ১৯১০ সাল থেকে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গবঙ্গ রদের গোপন তৎপরতা চালায় যা ১৯১১ সালে ঘোষণার মাধ্যমে বাস্তব রূপ পায়। এভাবে ভারতবর্ষের কিছু মধ্যবিত্ত ও পুঁজিপতি শ্রেণির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের কাছে ব্রিটিশ সরকার নতি স্বীকার করে।

০৫. **মুসলিম লীগের দূর্বলতা:** সদ্য প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ বঙ্গভঙ্গকে সভা-সমিতির মাধ্যমে সমর্থন জানালেও এর সাংগঠনিক ভিত ছিল খুব দূর্বল। কংগ্রেস যেভাবে হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতায় ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিল সে ধরনের কোনো কর্মসূচি মুসলিম লীগের ছিল না। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠনের পর বিভিন্ন সভা সমিতিতে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে বক্তব্য দেয়া হলেও দলের কোনো সাংগঠনিক কর্মসূচি এ সম্পর্কে ছিল না। ১৯০৮ সালে মুসলিম লীগের নতুন নেতৃত্বে আসেন নতুন কিছু মুখ, যারা দলকে সংগঠনিকভাবে ধীর গতিতে এগিয়ে নেন। যে কারণে বঙ্গভঙ্গ মুসলিম লীগের নেতাদের বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ থাকে, কংগ্রেসের সাংগঠিনিক কর্মসূচির মতো বঙ্গভঙ্গের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে তারা ব্যর্থ হন। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের চাপে মত পরিবর্তন করলেও মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে তাদের সে ধরনের চাপ ছিল না।

➘ বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া

০১. **হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া :** বঙ্গভঙ্গ রদে হিন্দুরা সন্তোষ প্রকাশ করে। জাতীয় কংগ্রেস একে স্বাগত জানায়। কংগ্রেস সভাপতি অম্বিকাচরণ মুজমদার ব্রিটিশ সরকারকে অভিনন্দন জানান। হিন্দু উগ্রপন্থীরা একে হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করে। এমনকি কংগ্রেস ইতিহাস লেখক পট্টভি সীতারাময় লিখেছেন, "১৯১১ সালে কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ রদ করে ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসনে ন্যায়নীতির পরিচয় দিয়েছে।"

০২. **মুসলমানদের প্রক্রিয়া :** মুসলমানরা এতে আহত হয়। তারা বঙ্গবঙ্গ রদ ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে এবং সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে হতাশা দেখা যায়। শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমানরা এতে উদ্বিগ্ন হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার উন্নয়নের যে ধারা চালু হয়েছিল এর ফলে মুসলমানরা তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকায় ক্ষুদ্ধ হয়। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। মুসলিম লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা যারা এতোদিন ব্রিটিশ সরকারের প্রতি গভীর আস্থাশীল ছিলেন তারা সরকারের সমালোচনায় নামেন। নবাব ভিকার-উল-মূলক তীব্র ভাষায় ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করে বলেন, বঙ্গভঙ্গ রদের কারণে ভবিষ্যতে মুসলমানগণ সরকারের কথা ও কাজের উপর আস্থা রাখতে পারবে না। মাওলানা মোহাম্মদ আলীও একই সুরে বলেন, মুসলমানদেরকে তাদের রাজভক্তির প্রতিদানে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বঙ্গভঙ্গের কারণে সবচেয়ে বেশি মর্মাহত হন নবাব সলিমুল্লাহ। তিনি ব্রিটিশ

সরকারকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করে বলেন, "বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে আমরা যে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলাম তা আমাদের বিরাট দুঃখের কারণ। কিন্তু আমাদের দুঃখ আরো বেশি তীব্র হয়ে ওঠে যখন দেখি সরকার আমাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করে কোনো পূর্বাভাষ না দিয়েই এই পরিবর্তনে বাস্তবায়ন করলেন।" বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষনার পর পর ৩০ ডিসেম্বর নবাব সলিমুল্লাহ আহ্বানে উভয় বাংলার নেতৃস্থানীয়দের এক সভায় স্বয়ং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী মুসলিম নেতা আবদুর রসুল, মৌলভী আবদুল মজিদ, খাজা আতিকুল্লাহ অংশ নেন। ব্যারিষ্টার রসুল পরে মুসলিম লীগে যোগ দেন। সভায় ভাইসরয়ের কাছে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে একটি স্মরকলিপি উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। বঙ্গবঙ্গ রদের ফলে মুসলমানরা নিজেদের স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্যবোধকে আরো পরিকল্পিতভাবে উপস্থাপনের জন্য মুসলিম লীগ মুসলমানদের মুখপাত্রে পরিণত হয়। শুধু পূর্ব বাংলায় নয় ১৯১২ সালে বঙ্গীয় মুসলিম কলকাতায় গঠিত হয়। পরবর্তীকালে এ দলই পূর্ব বাংলার মুসলমানদের নেতৃত্ব দেয়। এমনকি এর পর সলিমুল্লাহ স্বেচ্ছায় রাজনীতি থেকে অবসর নেন। ১৯১৫ সালে তিনি মারা যান।

০৩. **মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পরিবর্তন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্ব গ্রহণ:** বঙ্গভঙ্গ রদের সাথে সাথে মুসলিম লীগের নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এর নেতৃত্বে ঢাকার নবাব পরিবার, ধানবাড়ির নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, চট্টগ্রামের সৈয়দ শাসমুল হুদা, টাঙ্গাইলের স্যার এ.কে গজনবীসহ নেতৃত্ব অভিজাত ও জমিদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের অন্ধ অনুগত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ রদের পর মুসলিম লীগের নেতৃত্ব পরিবর্তন আসে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও যুব সম্প্রদায় এর নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এ শ্রেণি নিছক সাম্প্রদায়িকতার নয় বরং শিক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্যে, পেশায় উৎকর্ষতার মাধ্যমে হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, এ. কে. ফজরুল হকের নেতৃত্বে অসাম্প্রাদায়িক নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ আনুগত্যের বদলে স্বায়ত্বশাসনের দাবি তোলেন। এ.কে ফজলুল হক ১৯১২ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং পরের বছর এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক পরিষদে বঙ্গভঙ্গ রদের সমালোচনা করেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে পরিষদে বলেন, মুসলমানদের দাবির প্রতি উপেক্ষা করা হলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। বয়োজ্যেষ্ঠ মুসলিম লীগ নেতা সৈয়দ শামসুল হুদা এর প্রতিবাদ করলে শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় তাঁর বক্তৃতাকে 'বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা' বলে মনে করেন।

০৪. **হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রচেষ্টা:** নতুন মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিদ্বেষ নয় বরং সহযোগিতার পক্ষে ছিলেন। অন্যদিকে ভারতীয় কংগ্রেস ও হিন্দু নেতৃবৃন্দ তাদের মনোভাব পরিবর্তন করেন। ১৯১৩ সালের লক্ষ্মৌতে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে ভারতের জন্য স্বরাজ দাবি কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এখানে এ উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ডাকও দেয়া হয়। ফজলুল হক মুসলিম লীগের নেতা হয়েও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যোগ দেন এবং ১৯১৪ সালের মেদনীপুরে অনুষ্ঠিত বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। ব্যারিষ্টার আবদুর রসুলসহ অনেক নেতার সহযোগিতায় তিনি হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। এখানে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যুক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে আলোচনায় স্থির হয়, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে এ দুই রাজনৈতিক দল ব্রিটিশ সরকারের কাছে যুক্ত পরিকল্পনা উপস্থাপিত করবে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯১৬ সালে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার নীতির প্রশ্নে একটি সমঝোতায় আসে যা 'লক্ষ্মৌ চুক্তি' নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে উভয় দল ভারতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জোরদার হয়।

ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া : মুসলমানদের অসন্তোষ ব্রিটিশ সরকারকে ভাবিয়ে তোলে। বঙ্গভঙ্গ রদের পরের মাসেই (১৯১২ সালের জানুয়ারি) বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা সফরে আসেন। ৩১ জানুয়ারি ঢাকায় পূর্ব বাংলার মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাদের আশ্বাস দেন যে, নতুন প্রশাসনে ভারত সরকার ২ ফেব্রুয়ারি এক ইশতেহারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পেশ করে। ড. রাসবিহারী ঘোষবিহারী ঘোষসহ হিন্দু নেতৃবৃন্দের বিরোধীতা সত্ত্বেও তিনি ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সংস্থা গঠন করেন। এর সফল পরিণতিতে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে এ দেশের রাজনীতি, আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এভাবে দেখা যায় যে বঙ্গভঙ্গের উদ্যোগে প্রথমে ছিল প্রশাসনিক, কিন্তু ক্রমান্বয়ে এর রাজনৈতিক উদ্দেশেই প্রাধান্য লাভ করে। পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বঙ্গভঙ্গের পক্ষে থাকলেও পশ্চিম বাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার পদ্ধতি তৈরি করে। এ আন্দোলনকারীরা প্রথমবারের মতো সারা

বাংলায় একটি আন্দোলন গড়ে তোলার পদ্ধতি তৈরি করে। এ আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলনে পরিণত হয়। অন্যদিকে মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ সচেতন হয়। এর ফলে হিন্দু-মুসলমান সংঘাত দেখা দেয়। সাময়িকভাবে এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা চললেও সংঘাতই শেষ পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করে। বহু চেষ্টা করেও তাই ১৯৪৭ সালে যুক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যেগে সফল হয়নি। নিরূদ কুমার চৌধুরী এ সম্পর্কে তাঁর আত্মজীবনীতে বলেন, "The partition of Bengal left a permanent legacy of estrangement between the Hindu and the Muslims and that a cold dislike for the Muslime settled down in our hearts, putting an end to all real intimacy of friendship. This manifested itself in the streets, the schools and the market palce but above all, it found and abiding palce in the minds of me.''

পরিশেষে বলতে পারি, বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের মাধ্যমে লর্ড কার্জন ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করে ব্রিটিশ সম্রাজ্যকে সদৃঢ় করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু কার্জনের এই দূরবিসন্ধি মোটেই ফলপ্রসু হয়নি। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবিলম্বে সমগ্র বাংলায় আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠে এবং এর শেষ পরিণাম ঘটে বঙ্গভঙ্গ রদের মাধ্যমে। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে হিন্দুরা সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ ঘোষণা তাদের জন্য ছিল বিরাট আঘাত স্বরূপ। বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলার মুসলমানদের জীবনধারায় যে উন্নতির সূচনা হয়েছিল তা বঙ্গভঙ্গের রদের ফলে আবার রুদ্ধ হয়।

ভাষা আন্দোলন

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহের বিতর্কিত দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তারপর এ পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের 'রাষ্ট্রভাষা' কি হবে এ নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার চেষ্টা করেছিল, অন্যদিকে পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণ তাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করতে চেয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকচক্র বাংলার আপামর জনসাধারণের বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার ঘোষণা প্রদান করে। এর প্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাংলার আপামর জনসাধারণ তাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বুকের তাজা রক্ত দিয়ে রাজধানী পিচঢালা রাজপথ রাঙিয়ে তুলে। বাংলার ইতিহাসে এ আন্দোলনকে ভাষা আন্দোলন বলা হয়।

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

০১. **ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়:** ডিসেম্বর ১৯৪৭-এ করাচিতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত হয়। ফলে পূর্ববাংলায় এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে এ সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করে ঢাকায় সর্বপ্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয় এবং কতিপয় দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নীতি গৃহীত হয়। এ পরিষদের দাবি ছিল নিম্নরূপ:

ক. বাংলা ভাষা হবে পূর্ব বাংলার একমাত্র শিক্ষার বাহন এবং অফিস-আদালতের প্রধান মাধ্যম।

খ. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি- বাংলা ও উর্দু।

০২. **ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় :** ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য, বিশেষত কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি জানান। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এই দাবির বিরোধীতা করেন। ফলে ঢাকায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে চরম অসন্তোষ দেখা দেয় এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এভাবে সংগ্রাম পরিষদ ১৫ মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট ও হরতাল পালনের মধ্যে দিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন অব্যাহত রাখে। অবশেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলা ভাষায় দাবি সমর্থনের আশ্বাস দিলে আন্দোলন প্রশমিত হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় এবং কার্জ মহলের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' হিসেবে ঘোষণা দিলে আন্দোলন পুণরায় চাঙ্গা হয়ে ওঠে এবং দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়।

০৩. **ভাষা আন্দোলনের তৃতীয় ও শেষ পর্যায়-**

ক. **নাজিমুদ্দিনের ঘোষণা :** ১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন পুনরায় একই ঘোষণা দেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। ফলে ছাত্র-বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয় এবং আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এ আন্দোলনের অংশ হিসেবেই ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

খ. **রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি:** উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে রাষ্ট্রভাষা বাংলা আন্দোলনকে আরো তীব্রতর করার লক্ষ্যে ৩০ জানুয়ারি এক জনসভায় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয় এবং ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

গ. **ঐতিহাসিক মিছিল ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ :** ২১ ফেব্রুয়ারি উক্ত কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য তৎকালীন গভর্নর নূরুল আমিন সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদ-এর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশের সাথে ছাত্র-জনতার এক মারাত্মক সংঘর্ষ বাঁধে। এক পর্যায়ে পুলিশ মিছিলের উপর গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে প্রাণ হারান এবং আহত হন বহুসংখ্যক ব্যক্তি। এর ফলে সারা বাংলায় আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকায় এ ঘটনার প্রতিবাদে তিন দিন লাগাতার হরতাল পালিত হয় এবং দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে।

ঘ. **রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ :** অবশেষে তীব্র বিক্ষোভের মুখে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং সাময়িকভাবে প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন বাংলাকে অন্যতম জাতীয় ভাষা করার সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রস্তাব প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দিলে বাঙালি জাতির বিজয় অর্জিত হয়।

➘ ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব/ ভাষা আন্দোলন ও বাঙালি জাতীয়তাবোধ/ ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধের যোগসূত্র

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১. **জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি :** মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হল ভাষা। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠি পূর্ব বাংলার মানুষের সেই ভাষাকে পঙ্গু করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করতে গিয়ে বাংলার আপামর জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হয়, যার ভিত্তিতে তারা ভাষা আন্দালনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাজেই বলা যায়- বাঙালি জাতীয়তাবাদ বা জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

২. **দাবি আদায়ের শিক্ষা :** ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের ন্যায্য দাবি আদায়ের শিক্ষা দেয়। এজন্যই বাংলার আপামর জনগণ তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত করে তোলে।

৩. **সংগ্রামী চেতনা জাগ্রত:** ভাষা আন্দোলন জনগণের মধ্যে সংগ্রামী চেতনা জাগ্রত করে। ফলে ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, কর্মচারী প্রভৃতি সকল পেশার লোকদের মধ্যে ঐক্যের ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়। এরূপ চেতনাবোধ পরবর্তী আন্দোলন গুলোকে সফল করেছে। যার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ।

৪. **সাম্প্রদায়িকতার অবসান :** ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের মধ্য থেকে সাম্প্রদায়িকতা দূর করে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের মধ্যে একটি প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করে। আর এ কারণেই ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমান কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে যুদ্ধ করে স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশ পূর্ব বাংলার মানুষকে উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিল।

৫. **মুসলিম লীগের পরাজয় :** ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রতি বাঙালিদের একটি সার্বিক সমর্থন ছিল। তাই এ সমর্থনের প্রতিফলন আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাই ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে। উক্ত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তফ্রন্ট ভাষা আন্দোলনের ভিত্তিতে ২১ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে এবং প্রথম দফা ছিল রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি। এর ফলে যুক্তফ্রন্টের বিজয় হয় এবং মুসলিম লীগের পরাজয় ঘটে।

৬. **ছাত্র রাজনীতির প্রসার :** ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ফলে ছাত্র রাজনীতির প্রসার ঘটায়। এ আন্দোলন ছাত্রদেরক শিক্ষা দেয়, যে কোনো দাবি আদায় করতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এ শিক্ষার কারণেই ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে সহায়তা করে।

৭. **৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ :** ৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী মেনুফেস্টের ২১-দফার প্রথম দফাই ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭টি আসনের ২২৩টি আসন লাভ করে। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। এপ্রিল ১৯৫৪ সালে আইন পরিষদের অধিবেশনে মুসলিম লীগ পর্যন্ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত পোষণ করে। এটি ছিলো ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা বাঙালি জাতির জাতীয় ঐক্যের প্রতিফলন।

৮. **৫৬ সালে সংবিধানে স্বীকৃতি :** মার্চ ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৫৪ সালের প্রথম আইন পরিষদে গৃহীত ভাষা ফর্মুলা এ সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এটা ছিল বাংলা ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয়। সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা এবং ইংরেজিকে পরবর্তী ২০ বছরের জন্য সরকারি ভাষা হিসেবে চালু রাখার কথা উল্লেখ করা হয়।

৯. **রাজনৈতিক স্বাধিকার আন্দোলনে ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা:**

ক. ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতি সর্বপ্রথম অধিকার আদায়ে সচেতন হয়ে ওঠে;

খ. ভাষা আন্দোলনই সর্বপ্রথম রক্তের বিনিময়ে জাতীয়তাবাদী গণদাবি আদায়ের শিক্ষা ও প্রেরণা দান করে;

গ. ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের ঐক্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর গঠন এবং অধিকার আদায়ের ইস্পাত কঠিন শপথে বলীয়ান করে তোলে;

ঘ. এ আন্দোলন বাঙালি অভিজাত শ্রেণি ও জনসাধারণের মধ্যে সেতুবন্ধনে সহায়তা করে;

ঙ. ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তি আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে প্রেরণা যুগিয়েছে এই ভাষা আন্দোলনের রক্তরাঙা ইতিহাস।

১০. **৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন :** ৫২-এর একুশের চেতনায় ভাস্বর বাঙালি জাতি রাজনৈতিক অধিকার বা স্বাধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্বাধিকার অর্জনের দিকে এগুতে থাকে। ৬২-র 'হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট'-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলনে ছাত্র সমাজ ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ শিক্ষা দিবস ঘোষণা করে। ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধ বাঙালি জাতিকে এমন একটি ধারণা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে যে, পাকিস্তানিরা আমাদের শুধু নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করবে। তাই অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে লাহোর শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। ভাষা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ বাঙালি ছয় দফাকে জাতীয় মুক্তির প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে।

১১. **৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান ও ৭০ সালে নির্বাচন :** ৬৯-এর ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান এবং ৭০ সালের সাধারণ নির্বাচেন আওয়ামী লীগের জয়লাভের পেছনে প্রেরণা ও শক্তি যুগিয়েছিল ৫২-এর ভাষা আন্দোলন। ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী শেখ মুজিবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল আইনসঙ্গত। কিন্তু তা না করে শুরু হয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। প্রহসনমূলক আলোচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হবে না, প্রয়োজনে বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। সাংবাদিক এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস এটাকে 'বিশ শতকের সর্বাধিক জঘন্যতম প্রবঞ্চনা' বলে আখ্যায়িত করেন। আলোচনার নামে কালক্ষেপন করে ২৫ মার্চ, ১৯৭১ মধ্যরাত থেকে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে বাঙালি নিধন অভিযান শুরু হয়ে যায়। ফলে সকল ধরনের অহিংস তৎপরতার সুযোগ নস্যাৎ হয়ে যায়।

১২. **৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ :** উক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। এটি ছিল মহান ভাষা সংগ্রামের মধ্য গিয়ে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতির কাছে প্রত্যাশার চূড়ান্ত প্রাপ্তি। সে কারণে বাঙালি জাতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কবল থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। আর এতে প্রেরণা যুগিয়েছিল একুশের চেতনা। সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে ১৬ ডিসেম্বর' ১৯৭১ সালে হানাদার বর্বর পাকিস্তান বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে বাংলার বীর জনতা।

ভাষা আন্দোলন ও বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি এ দেশের আপামর ছাত্র সমাজের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে যে মাতৃভাষা বাংলা অর্জিত হয়েছে তার গণ্ডি এখন শুধু দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং একুশে ফেব্রুয়ারি এবং ভাষা আন্দোলনের চেতনা আজ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। ভাষার জন্য বাঙালি জাতির এ আত্মত্যাগ আজ নতুন করে বিশ্বকে ভাবতে শিখিয়েছে, মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে। ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯ জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) সাধারণ পরিষদে আমাদের জাতীয় চেতনার ধারক একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের মানুষ আজ বাঙালিদের মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলা ভাষা আজ যে বৈশ্বিক মর্যাদা লাভ করেছে তা মূলত আমাদের জাতীয় চেতনাবোধের বিজয়। ইউনেস্কোর গৃহীত প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে, "সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভাষা সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার, ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং বহু ভাষাভিত্তিক শিক্ষাকেই উৎসাহিত করবে না, বরং তা ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উন্নয়ন অনুধাবনের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।" বাংলাদেশসহ বিশ্বের মোট ১৯৩টি দেশ বর্তমানে একুশে ফেব্রুয়ারিকে পালন করছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। বাংলা ভাষা ও বাঙালির জন্য এ প্রাপ্তি সহস্র মর্যাদার প্রতীক।

পরিশেষে বলতে পারি, পূর্ব বাংলার জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে সূত্রপাত ঘটলেও মূলতঃ এটি ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই সর্বপ্রথম পূর্ব বাংলার জনগণ অধিকার আদায়ে সচেতন হয়ে উঠে। তাদের মধ্যে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মোষ ঘটে। ফলে জনগণের মনে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে জাগ্রত হয়। এই আন্দোলন পরবর্তীতে বাঙালি জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণের শিক্ষা, সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এক কথায় বলা যায়, ভাষা আন্দোলনের অনুপ্রেরণা বাঙালি মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম মূলমন্ত্র ছিল। সুতরাং বাঙালির জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৫৪'র প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাঙালি জাতি, বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি এবং বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের কার্যকলাপ ও পাকিস্তানি শাসকদের ছয় বছরের শোষণের বিরুদ্ধে এই নির্বাচন ছিল 'ব্যালট বিপ্লব'। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির কয়েক বছরের মধ্যেই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিভিন্ন উপদল, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ব্যর্থ শাসন, অঞ্চলভেদে বৈষম্যমূলক নীতি প্রভৃতির কারণে এই সময়ে পূর্ব বাংলায় আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-প্রজা পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, নেজাম-ইইসলামী, পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য স্ব স্ব জনসমর্থন যাচাইয়ের একটি সুযোগ সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের জাতীয় রাজনীতিতে এই নির্বাচন সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

➘ যুক্তফ্রন্ট গঠন

পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকারের প্রতি মুসলিম লীগ কোন সম্মান দেখায়নি। তাই তাদের প্রতি পূর্ব বাংলার জনগণের কোন আস্থা ছিল না। মুসলিম লীগ সরকার বার বার নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের সম্মুখীন হয়। বিক্ষুব্ধ মানুষের চাপের মুখে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ ছিল সবচেয়ে পুরাতন ও বড় রাজনৈতিক দল। বিভিন্ন দলের রাজনীতিবিদগণ বুঝতে পারেন ক্ষমতাসীন সরকারী দল মুসলিম লীগের সাথে নির্বাচনে জয়লাভ করা কঠিন হবে। ইতিমধ্যেই ১৯৪৯ সালে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি, শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

নির্বাচনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা নেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। দলগুলো ছিল–মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক-শ্রমিক পার্টি, মওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন নেজাম-ই-ইসলামী এবং হাজী দানেশের বামপন্থী গণতন্ত্রী দল। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা। ২১ ফেব্রুয়ারিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য যুক্তফ্রন্টের ইশতেহার করা হয় ২১ দফা। ২১ দফা কর্মসূচির মুখ্য রচয়িতা ছিলেন আবুল মনসুর আহমেদ। যুক্তফ্রন্ট তাদের ঐতিহাসিক ২১ দফা দাবিতে গণমানুষের অধিকারের কথা তুলে ধরে। সংক্ষেপে এই দফাগুলো হলো:

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা
২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ করা এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ
৩. পাটের ব্যবসা জাতীয়করণ করা
৪. সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রর্বতন করা
৫. পূর্ব পাকিস্তানে লবণ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা
৬. কারিগর মুহাজিরদের কাজের ব্যবস্থা করা
৭. বন্যা ও দুর্ভিক্ষ রোধের জন্য খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করা
৮. শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা
৯. অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা
১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা
১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা
১২. শাসন ব্যয় হ্রাস করা ও মন্ত্রীদের বেতন এক হাজার টাকার বেশি না করা
১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা
১৪. জন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি বাতিল করা
১৫. বিচার ও শাসন বিভাগ পৃকীকরণ করা
১৬. মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন 'বর্ধমান হাউস'কে বাংলা ভাষা গবেষণাগারে পরিণত করা
১৭. বাংলা ভাষা করার দাবিতে নিহত শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শহিদ মিনার নির্মাণ করা
১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস ঘোষণা করে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা
১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান
২০. আইন পরিষদের মেয়াদ কোনভাবেই বৃদ্ধি না করা
২১. আইন পরিষদের আসন শূন্য হলে তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচন দিয়ে তা পূরণ করা।

➘ নির্বাচন ও ফলাফল

১৯৫৪ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রধানত স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে। ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চের নির্বাচন ছিল পূর্ব বাংলায় প্রথম অবাধ ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে শতকরা ৩৭.১৯ ভাগ ভোটার ভোট দেয়। ২ এপ্রিল নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট। মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩টি আসন। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পায় ৯টি আসন। পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস ২৪টি, তফসিল ফেডারেশন ২৭টি, খেলাফতে রব্বানী ২টি, খ্রিস্টান ১টি, বৌদ্ধ ১টি, কম্যুনিস্ট পার্টি ৪টি আসন লাভ করে। নির্বাচনে মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনসহ মুসলিম লীগের বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা পরাজিত হন। মূলত মুসলিম লীগের সাংগঠনিক দূর্বলতা, রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তাদের অবস্থান, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা, পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক দুর্গতি ও নেতৃত্বের জনবিচ্ছিন্নতাই মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ।

➘ নির্বাচনের তাৎপর্য

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রথম অবাধ নির্বাচন। এ নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের অন্যায়, বৈষম্যমূলক, ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় এ অঞ্চলের মানুষের মনে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তাদের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জোরদার হয়। বাঙালি জাতি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে বুঝিয়ে দেয় যে তারা পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে আর চায় না। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভের মধ্যে দিয়ে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ ধারার সৃষ্টি হয়। বাঙালিরা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে মুসলিম লীগ খুব ভীত হয়ে পড়ে। এবার সুযোগ খুঁজতে থাকে কিভাবে এই বিজয়ের ফলাফলকে বানচাল করা যায়।

➘ মন্ত্রিসভা গঠন

যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। যুক্তফ্রন্টের অন্যতম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকায় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ৪ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি নিজে মুখ্যমন্ত্রির দায়িত্ব ছাড়াও অর্থ, রাজস্ব ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব নেন। মে মাসে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আবু হোসেন সরকার বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক শিক্ষা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেন। শেরে বাংলা এবং যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসন আদায়ের ব্যাপারে চেষ্টা চালাতে থাকেন। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই মন্ত্রিসভা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস ও সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং বর্ধমান হাউজকে বাংলা একাডেমি করার প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করেন। কেন্দ্রীয় সরকার এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

➘ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার অবসান

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ ভালভাবে গ্রহণ করেনি। শুরু থেকেই তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৫৪ সালের ৩০ এপ্রিল ফজলুল হক আমন্ত্রিত হয়ে কলকাতায় বক্তৃতা দেয়ার সময় শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে দুই বাংলা যে অভিন্ন তা বর্ণনা করেন। তাঁর এই বক্তৃতার সূত্র ধরে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা সুযোগ পেয়ে যান। তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। একই সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো হতে থাকে। মে মাসে কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে কারা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং আদমজী জুট মিলে বাঙালি ও বিহারী শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক গোলযোগ হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ বলে দায়ী করতে থাকে।

এই সময়ে 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ ফজলুল হকের এক সাক্ষাৎকার বিকৃত করে প্রকাশিত হয় যে তিনি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চান। এতে মুসলিম লীগ সরকার তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে ঘোষণা দেয়। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারী করেন। ঐদিনই বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের করাচি থেকে ঢাকা ফেরার পর বিমানবন্দরেই গ্রেফতার করা হয়। ২৩ ডিসেম্বর তিনি মুক্তি লাভ করেন। পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি ছিল ১৯৫৫ সালের ২ জুন পর্যন্ত। মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে মাত্র চার বছরে সাত মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। কেন্দ্রীয় সরকার তিনবার গভর্নরের শাসন জারি করে। যুক্তফ্রন্টের দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন বলবৎ ছিল।

STUDENT STUDY

ছয়দফা আন্দোলন

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির অব্যাহত বৈষম্য ও দীর্ঘ শোষণনীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তানি স্বাধিকার প্রশ্নে ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সাবজেক্ট কমিটির মিটিংয়ে প্রথম ছয় দফা কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন এবং ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয় দফা প্রস্তাব ও আন্দোলনের কর্মসূচি পেশ করেন। ভাষা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি ৬ দফাকে জাতীয় মুক্তির প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে। পাকিস্তানের স্বৈরশাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে এটি ছিল মারণাস্ত্রস্বরূপ।

➘ **ছয় দফা আন্দোলনের পটভূমি :** যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচিভিত্তিক আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. **পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অব্যাহত শোষণ :** ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় যা পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। ভৌগোলিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ব্যাপক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শুধু ধর্মের ওপর ভিত্তি করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অভ্যুদয় হয়। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ, নির্যাতন ও জাতিগত নিপীড়ন ও ও প্রশাসনিক বঞ্চনার সূচনা করে, যা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি করে।

২. **শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন :** পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কেন্দ্রকে শক্তিশালী করে তৎকালীন পূর্ব বাংলাকে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে রাজনৈতিক কর্মধারাকে জোর করে স্তব্ধ করার চেষ্টা চালায়। বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে ছিল বঞ্চিত। ফলে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়।

৩. **অর্থনৈতিক বৈষম্য :** পাকিস্তানের প্রায় সকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, স্টেট ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বীমা ও বৈদেশিক মিশনসমূহ পশ্চিমাংশে থাকার কারণে অর্থের মজুদও গড়ে ওঠে সেখানে। পূর্বাঞ্চলের পাট থেকে অর্জিত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিমাংশে ব্যয় করা হতো। পূর্বাংশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের নিজস্ব ক্ষমতা নেই-এ অজুহাতে সকল বৈদেশিক মুদ্রাই পশ্চিমাংশে চলে যেত। ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক বৈষ্যম্যের গগণচুম্বী প্রাচীর।

৪. **চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য :** পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালিদের প্রতি বিশেষ উদাসীন নীতি পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রীয় সিভিল চাকরির ক্ষেত্রে ১৬% এবং সামরিক বাহিনীতে ১০%-এর বেশি পূর্ব পাকিস্তানি ছিল না। স্থল, নৌ, বিমান ও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির সকল সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত ছিল। আইয়ুব সরকারের আমলে এ বৈষম্য ও বঞ্চনা তীব্র আকার ধারণ করে।

৫. **পূর্ববাংলায় তীব্র অসন্তোষ :** ১৯৫৪-৬৫ সালের নির্বাচনে বিজয় লাভের পর আইয়ুব সরকার ও তার সহযোগী মৌলিক গণতন্ত্রী আমলা, কনভেনশন ও মুসলিম লীগের সদস্যদের দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার পূর্ব বাংলার জনজীবনে যথেষ্ট মানসিক চাপ ও অসন্তোষের সৃষ্টি করে।

৬. **সামরিক অসহায়ত্ব :** পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অথচ ভৌগোলিক কারণে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলা উচিত ছিল। কিন্তু সকল সামরিক দপ্তর, অস্ত্র দপ্তর ও অস্ত্র কারখানা পশ্চিম পাকিস্তানেই স্থাপন করা হয়। আইয়ুব খানের যুক্তি ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানে নিহিত রয়েছে। কিন্তু ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ আইয়ুবের এই যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে।

৭. **১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ :** ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় থেকে বাঙালিরা নিজেদের অসহায়ত্ব বুঝতে পারে এবং নিজেদের নিরাপত্তা শক্তির ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এ যুদ্ধ বাঙালি জাতিকে এমন একটি ধারণা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে যে, পাকিস্তানিরা শুধু নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য আমাদের ব্যবহার করবে। তাই অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে লাহোরে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন।

➘ **ছয় দফা কর্মসূচি :** ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করার সময় শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফাকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি বলে উল্লেখ করেন। ঐতিহাসিক এ ছয় দফা কর্মসূচিতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধানের এক সুস্পষ্ট পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। নিচে ছয় দফা কর্মসূচির বিবরণ দেয়া হলো-

১. **প্রথম দফা-শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি :** ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সত্যিকার ফেডারেশন ধরনের সংবিধান রচনা করতে হবে। তাতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে এবং আইনসভার সার্বভৌমত্ব বজায় থাকবে।

বিশ্লেষণ : লাহোর প্রস্তাব ছিল অবিভক্ত ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রাণের দাবি। লাহোর প্রস্তাবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সকল বিধান উল্লেখ ছিল তার ভিত্তিতে ১৯৬৪ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের মুসলমানগণ রায় দিয়েছিল। আবার ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে

যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মূলে ছিল এ লাহোর প্রস্তাব। সুতরাং শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার প্রথম দফায় যে প্রস্তাব করেছেন তা নতুন কোনো প্রস্তাব ছিল না, যা পাকবাহিনীর মনঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা, সার্বজনীন ভোটাধিকার ও সার্বভৌম আইন পরিষদ-এই ছিল প্রথম দফার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

২. **দ্বিতীয় দফা- কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা:** দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়সমূহ থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। অবশিষ্ট সকল ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

বিশ্লেষণ: কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ক্ষমতা দিয়ে এক অর্থে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকেই তুলে ধরা হয়েছে। এই দফা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই বলেছেন, 'এই প্রস্তাবের জন্যই কায়েমি স্বার্থের দালালরা আমার ওপর সর্বাপেক্ষা বেশি চটেছে। আমি নাকি পাকিস্তানকে দু' টুকরো করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম।'

৩. **তৃতীয় দফা- মুদ্রা ও অর্থবিষয়ক ক্ষমতা:**

১. পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জন্য দুটো আলাদা ও সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন এবং দুটো স্টেট ব্যাংক স্থাপন করতে হবে।

২. দুই অঞ্চলে কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে দুই মুদ্রা থাকবে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে পারবে না। একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনে দুই অঞ্চলে দুটি রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

বিশ্লেষণ: তৃতীয় দফার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই বলেন যে, আমার এই প্রস্তাবের মর্মার্থ হলো এই যে, উপরোক্ত দুটো বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকবে। যে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নকশার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমন থাকবে। পার্থক্য শুধু এই যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়াজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ইস্যু করা হবে এবং তাতে পূর্ব পাকিস্তান বা সংক্ষেপে ঢাকা লেখা থাকবে। তদ্রূপ পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাপারেও উল্লেখ থাকবে। মূলত এ মুদ্রা ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করাই উদ্দেশ্য ছিল।

৪. **চতুর্থ দফা- কর ও শুল্কবিষয়ক ক্ষমতা :** সকল প্রকার কর ও শুল্ক ধার্য এবং তা আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আদায়কৃত রাজস্বের নির্ধারিত অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হবে।

বিশ্লেষণ : এই দফার সুবিধা অনেক। যেমন-

ক. কেন্দ্রীয় সরকারকে কর আদায়ের কোনো ঝামেলা পোহাতে হবে না।

খ. কর ধার্য ও আদায়ের জন্য কোনো দপ্তর বা কর্মকর্তার প্রয়োজন হবে না।

গ. কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের জন্য কর ধার্য ও আদায়ের মধ্যে কোনোরূপ দ্বৈততা থাকবে না। এতে অপচয় ও অপব্যয় রোধ হবে।

ঘ. এর ফলে কর ধার্য ও আদায়ের একত্রীকরণ সহজ হবে।

৫. **পঞ্চম দফা- বৈদেশিক বাণিজ্যবিষয়ক ক্ষমতা :** এ দফায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে নিম্নলিখিত শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হয় :

ক. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

খ. রাজ্য সরকার নিজেদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা নিজেদের এখতিয়ারে রাখবে।

গ. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সমানভাবে বা সংবিধানে নির্ধারিত হার অনুযায়ী আদায় করা হবে।

ঘ. দেশে উৎপাদিত পণ্য বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলে আমদানি-রপ্তানি হবে।

ঙ. বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি, ট্রেড মিশন স্থাপন ও আমদানি-রপ্তানির অধিকার রাজ্য সরকারকে দিতে হবে।

বিশ্লেষণ : পঞ্চম দফার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে ছয় দফার প্রবক্তাগণ বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্যে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছে। সে কারণে পুর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়ে না উঠায় পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নেই- এ অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হচ্ছে। ফলে পূর্ব পাকিস্তান অনুন্নতই থেকে যাচ্ছে।

৬. **ষষ্ঠ দফা- আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা :** পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য নিজস্ব গণবাহিনী বা আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করার ক্ষমতা দিতে হবে।

বিশ্লেষণ : ষষ্ঠ দফার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই বলেন যে, এ দাবি অন্যায়ও নয় আর নতুন নয়। কারণ যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা ভিত্তিক দাবির মধ্যে আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করা হয়েছিল।

ছয় দফা আন্দোলনের গুরুত্ব : পাকিস্তানে স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর শোষণ, নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে ছয় দফা ছিল বাঙালির মুক্তি সনদ। এ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন যে, ছয় দফা বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মজুর মধ্যবিত্ত তথা গোটা বাঙালির মুক্তি সনদ এবং বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত পদক্ষেপ। শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ার হচ্ছে ছয় দফা । এ আন্দোলন মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাইকে নিয়ে গঠিত বাঙালি জাতির আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের চাবিকাঠি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এ ছয় দফা আন্দোলন পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। নিচে ছয় দফা আন্দোলনের গুরুত্ব আলোচনা করা হলোঃ

প্রথমত, বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ছয় দফা আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় ছয় দফা দাবি ছিল বাঙালি জাতির 'মুক্তির সনদ'।

দ্বিতীয়ত, ছয় দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাগ্রত বাঙালি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বায়ত্তশাসন অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। ড. মুহাম্মদ হান্নান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থে বলেন, 'প্রকৃত পক্ষে ছয় দফা বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম স্মারক, যেখানে বাঙালিদের মুক্তি সংগ্রাম নতুনভাবে গতি লাভ করেছিল।'

তৃতীয়ত, ছয় দফা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সংগ্রামী শক্তি যোগায়। ছয় দফা কর্মসূচি বাঙালিদের কাছে পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে মুক্তির সনদ হিসেবে দেখা দেয়।

চতুর্থত, ছয় দফা আন্দোলন এর আগের আন্দোলনগুলোর তুলনায় অধিকতর গণমুখী ছিল। এতে সাধারণ মানুষও অধিকমাত্রায় অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া এ আন্দোলন জনগণের সংগ্রামী মনোভাবকে দৃঢ়তর করে।

পঞ্চমত, ছয় দফা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালিরা প্রথমবারের মতো সরাসরি সরকারি কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে। সংগ্রামী জনতা পুলিশের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এভাবে ছয় দফা আন্দোলন প্রচ্ছন্নভাবে ভবিষ্যতে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হবার প্রেরণা যোগায়।

পাকিস্তানি স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবির পটভূমিতে আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ছয় দফা দাবি ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার এক মূর্ত প্রতীক। ড. মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া বলেন, 'ছয় দফা আন্দোলনই পরবর্তীকালে একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়।' তাই যথার্থই বলা হয়ে থাকে, ছয় দফার মধ্যেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

STUDENT STUDY ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছিল। ফলে ছয় দফার আন্দোলনকে থামিয়ে দেয়ার জন্য সরকার এবার নতুনভাবে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী করে সরকার পক্ষ থেকে একটি মামলা করা হয়। সরকার পক্ষের অভিযোগ ছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অভিযুক্তরা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতে ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে গোপন বৈঠক করেছেন। সেই বৈঠকে ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। এ কারণে মামলাটির নাম হয় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। সরকারি নথিতে মামলার নাম ছিলো 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'। এটি ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা। ১৯৬৬ সালের ৮ মে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে আরও ৩৪ জনকে এই মামলার আসামী করা হয়।

আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত

বিচারকার্য চলার সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হয়। প্রতিবাদী মানুষ আসামীদের মুক্তি এবং মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিতে থাকে। অচিরেই এই আন্দোলন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে রূপ লাভ করে। একটি ঘটনা আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তোলে। ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে কর্তব্যরত অবস্থায় বিনা কারণে হত্যা করা হয়। এ ঘটনা দ্রুত পরিস্থিতি অশান্ত করে তোলে। ২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান তাঁর পদত্যাগের ঘোষণা দেন। ২২ ফেব্রুয়ারি সকল গ্রেফতারকৃত নেতা মুক্তি লাভ করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি মুক্তিপ্রাপ্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে রেসকোর্স ময়দানে এক বিরল গণসংবর্ধনায় 'বঙ্গবন্ধু' খেতাবে ভূষিত করা হয়। ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন।

এগার দফা আন্দোলন

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার মধ্য দিয়ে সামরিক শাসন ও আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলন যখন তীব্র হচ্ছিল তখন নেতৃত্বের পুরো ভাগে চলে আসে ছাত্ররা। এ সময়ে ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এই পরিষদ ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে এগার দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগার দফা কর্মসূচির ভেতর ছয় দফাও অন্তর্ভূক্ত ছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল শিক্ষা সংক্রান্ত বেশ কিছু দাবি। এগার দফা কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স বাতিলের কথা বলা হয়। তাছাড়াও শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের স্বাধীনতা, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, কৃষক ও শ্রমিকের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ, নিরাপত্তা আইন ও জরুরী আইন প্রত্যাহার এবং রাজবন্দিদের মুক্তি প্রভৃতি দাবি অন্তর্ভূক্ত ছিল। এভাবে ট্রমে ছয় দফা ও এগার দফার মধ্য দিয়ে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিতে থাকে।

↘ ১৯৬৯ সালের অভ্যুত্থান

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন দানা বাঁধে তা ছাত্রসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে শহরে ও গ্রামের শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে যা ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। আইয়ুব খানের পতনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের দুই অংশের মানুষ প্রথমবার একসাথে আন্দোলনে নামে। আইয়ুব খানের পতনের মধ্যে দিয়ে আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি জাতিগত নিপীড়ন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের সূত্রপাত করে। তাদের এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬০ এর দশকে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টিতে এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই আন্দোলন ছিল সবচেয়ে বড় আন্দোলন।

↘ গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপট

১৯৬৯ সালের গণভ্যুত্থানের মূল কারণ ছিল আগরতলা মামলা দায়ের ও নেতাদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার, ছাত্রদের ওপর পুলিশী নির্যাতন। আর এ অভ্যুত্থানের পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ ও নির্যাতনের ফলে পাকিস্তানি শাসকদের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কোন আস্থা ছিল না। এর ফলে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতম হচ্ছিল। আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়েও আন্দোলন থামাতে পারেনি।

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসের ছাত্র অসন্তোষ গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। ৬ ডিসেম্বর 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের জন্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন ও পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি মিলে পল্টন ময়দানে একটি জনসভা আয়োজন করে। জনসভার পর একটি বিরাট অংশ মিছিল করে গভর্ণর হাউস ঘেরাও করলে পুলিশের সাথে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এর প্রতিবাদে প্রধান বিরোধী দলগুলোর ডাকে ৮ ডিসেম্বর সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। ১০ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ 'নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' পালন করে। ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ডাকসুর নেতৃবৃন্দ মিলে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার সাথে মিলিয়ে আরও কয়েকটি দাবি নিয়ে ১১দফা দাবি পেশ করে। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের ৮টি রাজনৈতিক দল মিলে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' (ডাক) নামক একটি মোর্চা গঠন করে ৮ দফা দাবি পেশ করে। এরপর 'ডাক' ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ প্রচেষ্টায় পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে ওঠে।

'ডাক' এর আহ্বানে ১৪ জানুয়ারি সমগ্র পাকিস্তানে পূর্ণ দিবস হরতাল পালিত হয়। হরতালে পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে ১৮ জানুয়ারি ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ধর্মঘটে পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ২০ জানুয়ারি সারা পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের গুলিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হন। আসাদের মৃত্যুর প্রতিবাদে ২২, ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষিত হয়। ২৪ তারিখে পুলিশ ছাত্রদের মিছিলে বাধার সৃষ্টি করলে বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত রাস্তায় নেমে এসেছিল ছাত্র জনতা।

পুলিশের বাধা পেয়ে মিছিল আরও দুর্বার রূপ নেয়। মিছিলকারীরা সেক্রেটারিয়েট ভবন আক্রমণ করে এবং একাংশে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঢাকা নগরী বিপ্লবী মিছিলকারীদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এবার মিছিল থেকে সরকারী পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান ও সরকার সমর্থক দৈনিক মর্নিং নিউজ অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতদিন আন্দোলন ছিল ছাত্র ও আইনজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ২৪ তারিখে তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। মিছিলে যোগ দেয় রিকশা ও মোটর যানের চালক আর শ্রমিক সম্প্রদায়। আন্দোলন যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে তখন পুলিশকে সাহায্য করার জন্য শহরে ই.পি.আর নামানো হয়। ই.পি.আর বিভিন্ন স্থানে গুলি চালায়। এতে আন্দোলন না থেমে আরও বেগবান হয়। ২৪ জানুয়ারির পর থেকে লাগাতার আন্দোলন ও হরতালে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে বহুসংখ্যক মানুষ নিহত ও আহত হন।

➘ গণ অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া

১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর প্রতিবাদে জনতা আগরতলা মামলার বিচারপতির বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার ঢাকায় কারফিউ জারি করে। ১৮ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর শামসুজ্জোহাকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে। এরপর আন্দোলন আরও বেগবান হলে দেশের পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। আইয়ুব খান অবস্থা বেগতিক দেখে বিরোধী দলের নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। কিন্তু বিরোধী দলীয় নেতারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান বাধ্য হয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি এক বেতার ভাষণে ঘোষণা দেন যে, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হবেন না। একই সাথে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে রাজবন্দিদের মুক্তির আদেশ ঘোষণা করেন।

২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তি দেয়া হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ সদ্য কারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খানের সাথে গোলটেবিল বৈঠকে ছয় দফা ও এগার দফার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু অটল থাকেন। গোলটেবিলের আলোচনা বারবার ব্যর্থ হতে থাকে এবং দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। মার্চ মাসে সেনাবাহিনীর গুলিতে ৯০ জন নিহত হয়। অবশেষে ১০ মার্চের বৈঠকে আইয়ুব খান সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি ২২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খানকে সরিয়ে দিয়ে ড. এম এন হুদাকে নতুন গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তাতেও গণআন্দোলন শান্ত হয়নি। তখন তিনি ২৫ মার্চ সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খান বিরোধী গণঅভ্যুত্থান সফলতা অর্জন করে।

➘ গণ অভ্যুত্থানের গুরুত্ব

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল আইয়ুব খানের শাসনামলে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আন্দোলন। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ ও প্রতিবাদের সৃষ্টি হয় তার সাফল্যজনক পরিণতি আইয়ুব খানের পতন। এ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সংসদীয় সরকার ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বীকৃতি মিলে। স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বাঙালির যে জাতীয়তাবোধ ১৯৪৮ সালে সৃষ্টি হয় তা পূর্ণতা পায় ঊনসত্তর সালের এই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে। ১৯৬৯- এর গণঅভ্যুত্থান জাতীয় চেতনার প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের সময় এ ছুটি বাতিল করা হয়েছিল। ১৯৭০ সালের আওয়ামী লীগের বিজয়ের পেছনে ৬৯- এর গণ অভ্যুত্থানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭০'র জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন

পাকিস্তান রাষ্ট্রের ২৪ বছরের ইতিহাসে ১৯৭০ সালে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের একাধিক রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করলেও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল লক্ষণীয়। নির্বাচনী ফলাফল ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পূর্বাঞ্চলকে একটি পৃথক অঞ্চল হিসেবে প্রমাণ করে। নির্বাচনের ফলাফল ছিল ছয় দফাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় এবং নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে একদিকে পশ্চিমা শাসকবর্গ পূর্ববাংলার ওপর তাদের কর্তৃত্বের বৈধতা হারায়, অপরদিকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথ প্রশস্ত করে।

ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে ২৬ মার্চ এক বেতার ভাষণে পরবর্তী নির্বাচন ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ তারিখের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের ও ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ধার্য হয়। তবে ১২ নভেম্বর পূর্ববাংলার কিছু অঞ্চলে ভয়াবহ ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হওয়ায় ঐ সব অঞ্চলে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

➘ নির্বাচনের গুরুত্ব

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর ১৯৭০ সালের নির্বাচনই ছিল বেশি অবাধ ও নিরপেক্ষ। এজন্য এ নির্বাচনের গুরুত্ব সর্বাধিক। তাছাড়া বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে বিভিন্ন দিক থেকে এ নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

১. **বাঙালি স্বাতন্ত্র্যবাদের বিজয়:** ১৯৪৭ সালের পর থেকেই বাঙালি জাতি ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যবাদ দাবি করে আসছিল। পশ্চিম পাকিস্তান নানা উপায়ে তাদেরকে দমিয়ে রেখেছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির সে স্বাতন্ত্র্যবাদের বিজয় ঘটে।

২. **আঞ্চলিক প্রাধান্য:** এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও পিপিপি আঞ্চলিক প্রাধান্য লাভ করে। ফলে উভয় দলই এককভাবে কোন অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব করার বৈধতা হারায়। একই সাথে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে শাসন অবৈধ বলে প্রমাণিত হয়।

৩. **স্বায়ত্তশাসনের দাবির বৈধতা প্রমাণ:** বাঙালি জাতি দীর্ঘদিন থেকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে আন্দোলন করছিল। সরকার এ দাবিকে অবৈধ বলে প্রত্যাখান করেছিল। অবশেষে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের রায় বাঙালিদের ৬ দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির বৈধতা প্রমাণ করে।

৪. **বাঙালি জাতীয়তাবাদ সুদৃঢ়করণ:** ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যদিয়ে পূর্ববাংলায় যে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তা আরো সুদৃঢ় হয়।

৫. **আওয়ামী লীগের গুরুত্ব বৃদ্ধি:** ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ববাংলায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এ অঞ্চলে আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবুর রহমানের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে এবং পরবর্তী যে কোন জাতীয় প্রশ্নে এ দলের নেতৃত্বের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৬. **বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে প্রভাব:** নির্বাচনের পূর্বে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, নির্বাচনে বিজয়ী দল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ গঠন করবে এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক সংবিধান প্রণয়ন করবে। কিন্তু নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশভাবে বিজয়ী হওয়ায় শুরু হয় ষড়যন্ত্র। ফলে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। তাঁর এ ঘোষণা যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, বাঙালি জাতি তা স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবং তারা এটাও উপলব্ধি করল যে, যুদ্ধের মাধ্যমেই তাদেরকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হবে।

➘ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণ

১৯৭০ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব সাফল্য লাভের পেছনে কতগুলো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যথা–

প্রথমত, আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ছয় দফাভিত্তিক দাবি পূর্ববাংলার জনসাধারণকে আকৃষ্ট করেছিল। বস্তুতপক্ষে এসব দাবি ছিল এ অঞ্চলের আপামর জনসাধারণের প্রাণের দাবি এবং নির্বাচনের পূর্বেই এসব দাবি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ফলে নির্বাচনে জনসাধারণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে মূলত তাদের দাবির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছে।

দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিমাঞ্চলের শাসকবর্গ নানা উপায়ে পূর্বাঞ্চলকে শোষণ করেছে। এ শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। তাই নির্বাচনে পশ্চিমা দলগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে তারা প্রতিশোধ আদায় করেছে।

তৃতীয়ত, নির্বাচনী প্রচারণায় শেখ মুজিব ইসলামি আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে এ অঞ্চলের ধর্মপ্রাণ মানুষের সমর্থন পেয়েছেন।

চতুর্থত, ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের বন্যায় এ অঞ্চলে জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। পাকিস্তানের শাসকবর্গ এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়। শেখ মুজিব বন্যার্ত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও সরকারের ব্যর্থতা প্রচার করে নির্বাচনে সফলতা অর্জন করেছেন।

পঞ্চমত, শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত ইমেজ আওয়ামী লীগের বিজয়ের পেছনে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। নেতা হিসেবে তিনি ছিলেন সবার প্রিয় এবং বক্তা হিসেবে সবার উর্ধ্বে। তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করতে পেরেছেন যা নির্বাচনে প্রভাব ফেলেছিল।

ষষ্ঠত, ভুট্টো এক-ইউনিটের কথা ঘোষণা করে পাঞ্জাবিদের নিকট জনপ্রিয়তা পেলেও পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের নিকট বিরাগভাজন হন।

সপ্তমত, ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের প্রতি অনুগত না হয়েও ইসলামি সমাজতন্ত্রের কথা প্রচার করে ভুট্টো পাকিস্তানের ইসলামপন্থীদের সমর্থন পান নি। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল অ-মুসলমান। ফলে তারা ভুট্টোর ইসলামি প্রচারণার বিপরীতে আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়েছিল।

অষ্টমত, ভুট্টো সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থে সমাজতন্ত্রের কথা ঘোষণা করে পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের সমর্থন হারান।

নবমত, সর্বোপরি ১৯৪৭ সালের পর থেকে পূর্ববাংলায় যে স্বাতন্ত্র্যবাদ ও পৃথক জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল '৭০ সালের নির্বাচনে তা আওয়ামী লীগের পক্ষেই কাজ করেছিল। এক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত ইমেজ ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপট আওয়ামী লীগের বিজয়কে সহজ করেছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রভাব

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান বিজয় অর্জনের পিছনে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ভূমিকা ছিল উল্লেখ করার মতো। মূলত পাকিস্তানের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়েই। বাংলাদেশ নামক দেশের জন্মের ইতিহাসের পাতায় যতগুলো ছবি প্রজ্বলিত তার মধ্যে অন্যতম ১৯৭০ 'র সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনের ফলাফল যেমন মানুষকে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস আর নিজেদের চেনার সুযোগ তেমনি নির্বাচন পূর্ববর্তী- পরবর্তী ঘটনাও বাংলাদেশের মানুষকে এনে দিয়েছে সুখের বার্তা- একটি স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ।

৭০'র নির্বাচনের ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে একে ৩ টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়-

১. নির্বাচন পূর্ববর্তী; ২. নির্বাচনের ফলাফল ও ৩. নির্বাচন পরবর্তী।

০১. **নির্বাচন পূর্ববর্তী ভূমিকা :** ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর এদেশে শুরু হয় ভয়াল ঘূর্ণিঝড়। দেশের প্রায় ৫ লাখ মানুষ প্রাণ হারায় এতে। এর ভূমিকাও স্বাধীনতায় অবদান রেখেছে-

- ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্তদের জন্য কোনো প্রকার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি পাকিস্তান সরকার। ফলে এদেশের মানুষের মনে তাদের প্রতি আস্থাহীনতার জন্ম নেয়।
- পাকিস্তান সরকার বিদেশি গণমাধ্যমে মিথ্যাচার করে বেড়ায় যে এ দুর্যোগের ভয়াবহতা তারা জানত না, যা ছিল তাদের সাজানো নাটক এবং বাংলার জনগণ তা বুঝতে পেরেছিল।
- ঘূর্ণিঝড়ে আওয়ামী লীগ, তথা স্থানীয় নেতৃবৃন্দ-ই একমাত্র ভরসা হিসেবে উপস্থাপিত হয়।

০২. **নির্বাচনী ফলাফল :** নির্বাচনী ফলাফল-ই ছিল বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রধান উপাদান। সামরিক শাসন থেকে মুক্তি পেতে কেবল আওয়ামী লীগ তথা এ অঞ্চলের ভাবনা, এ অঞ্চলের মানুষ-ই ভাবতে পারে এরূপ মনোভাব এ নির্বাচনের মাধ্যমেই ফুটে ওঠে-

- পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানি কোনো দল এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানি কোনো দল একটিও আসন পায়নি। ফলে এ নির্বাচন-ই দেশকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে।
- আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল ৬ দফা, ফলে মানুষ ছয় দফার পক্ষে রায় দিয়েছে যার মধ্যে স্বাধীনতার বীজ উপ্ত ছিল।
- বাংলাদেশে একক রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। অর্থাৎ সামগ্রিক পাকিস্তান পুষ্ট মুসলিম লীগ কিংবা জামাত-ই ইসলামীর সাফল্য তেমন চোখে পড়ার মত নয়। তাই বাংলাদেশ গড়ার সংকেত এখানেই নিহীত হয়।

০৩. **নির্বাচন পরবর্তী ভূমিকা:** পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খাঁন ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তারা যে গড়িমসি করেছেন তা যেহেতু ৭০'র নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল, অতএব এর ভূমিকা অনেক, যা নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো-

- ইয়াহিয়া খাঁন মূলতঃ জুলফিকার আলী ভূট্টোর প্ররোচনায় ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গড়িমসি করলে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাধে।
- ভূট্টো-ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক কখনোই কাম্য হওয়ার কথা ছিল না যেহেতু ভূট্টো পেয়েছিল মাত্র ৮৮ টি আসন, সেখানে মুজিব পায় ১৬৭ টি আসন।
- ইয়াহিয়া খান ভূট্টোর কথাকে বেশি গুরুত্ব দিতে থাকেন ও কিছু অসাড় মিটিং করতে থাকেন।
- সর্বশেষ মার্চ ৩ তারিখে এসেম্বলি বসার কথা থাকলেও ১ তারিখে আবার না করে দেয়ায় সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলন গড়ে ওঠে ফলশ্রুতিতে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজন পড়ে ও বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

নিচে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য আলোচনা করা হলো-

০১. **বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় :** বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী যে বীজ অঙ্কুরিত হয় তা ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং সর্বশেষ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শক্তি যোগায়।

০২. **শোষণ থেকে মুক্তির চেতনা অর্জন :** ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের উপর বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। এহেন শোষণের প্রেক্ষাপটে ১৯৭০ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন বাঙালি জনগণকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন শোষণ থেকে মুক্তি আগ্রহকে বলিষ্ঠতর করে তোলে। নির্বাচনের ফলাফল এ চেতনাকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

০৩. **পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্ব হ্রাস :** ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে নির্বাচিত হলে পূর্ব পাকিস্তানের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব হ্রাস পেতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তান তখন শেখ মুজিবুরের নির্দেশ পরিচালিত হতে থাকে, যা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর জন্য ছিল চরম অবমাননাকর ও ঈর্ষণীয়।

০৪. **সংগ্রামী মনোভাবের সৃষ্টি :** ১৯৭০ সালে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাজে ইয়াহিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করেন। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সংগ্রামী হয়ে পড়ে। শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন, যা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেয়।

০৫. **রাজনৈতিক নেতৃত্বের সৃষ্টি :** ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়। শেখ মুজিবের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। জনগণ তাকে সর্বাত্মক সমর্থন দেন।

০৬. **আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল সৃষ্টি :** রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে কোনো জাতি গোষ্ঠীর জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে ভালো ফল করে। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে শুধু সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলো ভালো করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক নির্বাচন এবং এ নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে আঞ্চলিক দলসমূহ।

০৭. **স্বাতন্ত্র্যবোধের বহিঃপ্রকাশ :** পাকিস্তানের উভয় অংশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ভিন্নতা প্রভৃতির ভিত্তিতে যে স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে তা প্রতিভাত হয়ে ওঠে। ফলে বাঙালিরা নিজেদের আলাদা করে ভাবতে শিখে।

০৮. **পাকিস্তানের মৃত্যুর বার্তাবাহক :** ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোনো আসন লাভ করতে পারেনি আবার পিপল্‌স পার্টি পূর্ব পাকিস্তানের কোনো আসনই লাভ করতে পারেনি। তাই বলা যায়, এই নির্বাচন যুক্ত পাকিস্তানের মৃত্যুবার্তা বহন করে।

০৯. **পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যাশা ব্যর্থ :** পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ধারণা ছিল আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়ে অন্যান্য দলের সাথে কোয়ালিশন গঠনে বাধ্য হবে। কিন্তু আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ফলাফল পাকিস্তানিদের প্রত্যাশা ব্যর্থ করে দেয়।

১০. **প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব সৃষ্টি :** ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত দুই পাকিস্তানের মাঝে পরোক্ষ যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল তা প্রকাশ্যে রূপ নেয় নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের অভূতপূর্ব সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গ পূর্ববাংলার জনগণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে মেতে উঠে।

১১. **আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি :** শোষিত-লাঞ্ছিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত পূর্ববাংলার জনমনে ১৯৭০ সালের নির্বাচন আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। আর এ আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়েই বাঙালিরা স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১২. **অধিকার আদায় :** পূর্ববাংলার জনগণ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রেই বঞ্চিত ছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার অধিকার বঞ্চিত জনগণ অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

সবশেষে বলা যায় যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগই শুধু বিজয়ী হয়নি সেই সঙ্গে বিজয়ী হয়েছে পূর্ব বাংলার মানুষের মুক্তির চেতনা। পাকিস্তানের উভয় অংশের বৈসাদৃশ্য ঢেকে রাখার যে প্রবণতা ছিল তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় এই নির্বাচনের ফলাফলে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত চলমান অসহযোগ আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রথম পর্ব। নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সামরিক সরকারের অযথা গড়িমসি ও প্রতারণা এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর অসহযোগিতা ছিল এ অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান কারণ। এ আন্দোলনের ব্যাপ্তি ছিল খুবই ব্যাপক এবং তাৎপর্যপূর্ণ। এই আন্দোলনের সাফল্যজনক পরিণতিতে বাঙালি জাতি যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শহিদমিনারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী?

১৯৫২ সালে এ দেশের ছাত্র-জনতা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে নিজেদের জীবনকে যে উৎসর্গ করেছিল, তাদের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতে প্রতিষ্ঠা করা হয় কেন্দ্রীয় শহিদমিনার। কেন্দ্রীয় শহিদমিনার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও জাতীয় সংসদ ভবন বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোর প্রধানতম। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে জাতীয় চেতনার আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর বুক চিরে বাংলাদেশ নামক একটি দেশের জন্ম দিয়েছিল। ১৯৪৭ সালে নতুন স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীন পাকিস্তানের পথচলা শুরু হলেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিকসহ সার্বিক বিবেচনায় পাকিস্তানের দুই অংশের বিভাজন ছিল স্পষ্ট। ২৩ বছরের শাসনে পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকেরা হাজারো রকম বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে এ দেশের জনগণ পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দুর্বার গণআন্দোলন করে ১৯৭১ সালে মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত স্বাধিকার আন্দোলনের যে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব রয়েছে তার স্বাক্ষ্য বহন করেছে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ। স্বাধীনতার পরে জাতীয় সংসদ ভবন হয়ে ওঠে দেশ পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু। নিচের আলোচনায় এসব স্থাপনার গুরুত্ব তুলে ধরা হল-

কেন্দ্রিয় শহিদমিনার : ভাষাশহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনে নিহত শহিদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার উদ্দেশ্যে ঢাকা মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে এই স্তম্ভ নির্মিত হয়, যা বর্তমানে কেন্দ্রীয় শহিদমিনার' নামে পরিচিত শহিদমিনারটি প্রথম নির্মিত হয় ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। এর পরিকল্পনা, স্থান নির্বাচন ও নির্মাণকাজ সবই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে সম্পন্ন হয়। বর্তমান শহিদমিনারের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে শহিদদের রক্তভেজা স্থানে সাড়ে ১০ ফুট উঁচু এবং ৬ ফুট চওড়া ভিত্তির ওপর ছোট স্থাপত্যটির নির্মাণকাজ শেষ হলে এর গায়ে 'শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ' লেখা একটি ফলক লাগিয়ে দেওয়া হয়। নির্মাণের পরপরই এটি শহরবাসীর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে; প্রতিবাদী আন্দোলনের প্রতীকী মর্যাদা লাভ করে। এখানে দলে দলে মানুষ এসে ভিড় জমায়। ১৯৫২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন আনুষ্ঠানিকভাবে শহিদমিনার উদ্বোধন করেন।

কেন্দ্রীয় শহিদমিনারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

০১. **স্বাধীনতার প্রথম আন্দোলনের সাক্ষী :** পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণের কবল থেকে মুক্তির সংগ্রাম শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এ আন্দোলন বাঙালি জাতির মাঝে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করে। সমগ্র জাতিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে শেখায়। এ আন্দোলনের শিক্ষা পরবর্তীতে বাঙালি জাতিকে ১৯৭১ সালে মুক্তির সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহায্যে করে।

০২. **ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক :** ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা মেডিকেলের সামনে থেকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিল বের করে। মিছিল সামানে অগ্রসর হতেই পুলিশ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। নিহত হয় সালাম, বরকত, রফিক, জব্বরসহ আরো নাম না জানা অনেকে। প্রতি বছর সমগ্র জাতি ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদমিনারে খালি পায়ে ভাষাশহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। তাই এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিসৌধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী?

জাতীয় স্মৃতিসৌধ : ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত স্বাধিকার আন্দোলনের যে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব রয়েছে তার স্বাক্ষ্য বহন করছে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ । নিচের আলোচনায় স্থাপনাটির গুরুত্ব তুলে ধরা হলো :

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে নবীনগরে এই স্মৃতিসৌধের শিলান্যাস করেন। পরবর্তী ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্মৃতিসৌধটি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং নকশা আহ্বান করেন। ১৯৭৮-এর জুন মাসে প্রাপ্ত ৫৭টি নকশার মধ্যে সৈয়দ মাইনুল হোসেন প্রণীত নকশাটি গৃহীত হয়। ১৯৭৯ সালে মূল স্মৃতিসৌধের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ১৯৮২ সালে বিজয় দিবসের অল্প পূর্বে সমাপ্ত হয়।

জাতীয় স্মৃতিসৌধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব :

০১. **বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাতটি পর্যায়ের নিদর্শন :** ঢাকার অদূরে সাভারের নবীনগরে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাংলাদেশের স্বাধীনতা। সংগ্রামের সাতটি ধারাবাহিক পর্যায়কে নির্দেশ করে। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচিত, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ১৯৬২ সলের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ এর ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ-এই সাতটি ঘটনাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিক্রমা হিসেবে বিবেচনা করে নির্মিত হয়েছে জাতীয় স্মৃতিসৌধ।

০২. **মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা :** বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি হয়। জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাংলাদেশের জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের স্মরণে নিবেদিত এবং মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের প্রতি জাতির শ্রদ্ধার উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত স্মৃতিসৌধে গিয়ে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত :

বাংলার বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে ভূমি ও রাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন। ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস বড়লাট হয়ে বাংলায় এসে রাজস্ব সংস্কারের লক্ষ্যে একজন বিশেষজ্ঞ জন শোরকে দায়িত্ব দেন। ১৭৮৬-৮৯ পর্যন্ত দীর্ঘ গবেষণা শেষে তার রিপোর্টের ভিত্তিতে কর্ণওয়ালিস ১৭৯০ সালে একটি দশসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। এ দশসালার ওপর ভিত্তি করে তিনি ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ একে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে ঘোষণা করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল বৈশিষ্ট্য হলো

১. জমিদারগণকে বাৎসরিক নির্দিষ্ট হারে রাজস্বের বিনিময়ে জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া হয়।

২. জমির ওপর জমিদারদের মালিকানা, ক্ষমতা এবং অধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. জমিদারগণ যে কোনো শর্তানুসারে জমি ইজারাদানের ক্ষমতা লাভ করে।

৪. ভূমি রাজস্বের কিস্তি নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে দিতে অসমর্থ হলে জমি নিলামে বিক্রি করার অধিকার সরকারের হাতে থাকে (এ নিয়ম 'সূর্যাস্ত আইন' নামে পরিচিত)।

৫. তবে রাজস্ব আদায় ও বিচার ক্ষমতা সরকারের হাতে ন্যস্ত ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার জনগণের জন্য ছিল অভিশাপস্বরূপ। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে শোষণ ও তোষণ নীতি মাথাচড়া দিয়ে ওঠে।

আওয়ামী লীগের ৬ দফা :

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ছয় দফা আন্দেলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অব্যাহত বৈষম্য ও শোষণনীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার প্রশ্নে ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় দেশবরেণ্য নেতা ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার দাবি সম্বলিত ৬ দফাভিত্তিক এক কর্মসূচি প্রথম ব্যক্ত করেন। ইতিহাসে এটিই 'ছয় দফা কর্মসূচি' নামে পরিচিত।

দফাসমূহ :

১. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকারের ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্ররূপে গড়তে হবে। এতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং আইনগুলো হবে সার্বভৌম। সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে।

২. কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল সরকারের এখতিয়ারে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র এ দুটি বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে এবং দুই অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র ব্যাংক থাকবে। এ ব্যবস্থায় বিকল্পস্বরূপ দুই অঞ্চলের জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে একই মুদ্রা থাকতে পারে।

৪. সকল প্রকার কর, খাজনা ধার্য ও আয়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রাজস্বের নির্দিষ্ট একটি অংশ। কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে, যা দিয়ে ফেডারেল তহবিল গড়ে উঠবে।

৫. বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে আয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রা আঞ্চলিক ভিত্তিতে হিসাব রাখতে হবে। এক অঞ্চলের আয়কৃত অর্থ সেই অঞ্চলেই ব্যয় হবে। তবে কেন্দ্র এ আয়ের একটি নির্ধারিত অংশ পাবে।

৬. অঙ্গরাজ্যগুলো তাদের আঞ্চলিক প্রতিরক্ষার জন্য মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠনের অধিকার থাকবে।

ছয় দফা দাবি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় মুক্তির সন। ছয় দফা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে দুই অঞ্চলের মধ্যে বিরাজমান অসমতা কমে আসত এবং পাকিস্তান একটি শক্তিশালী ফেডারেল রাষ্ট্ররূপে বিকাশ লাভ করতে পারত। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একগুয়েমির ফলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়ার তাৎপর্য

প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকেই আওয়ামী মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলার জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সকল স্বার্থ রক্ষায় এক দিকে আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত রাখে, অন্যদিকে সংসদ ও প্রাদেশিক সরকারের সদস্যগণ সর্বত্র সোচ্চার হতে থাকেন। অবশ্য মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের দুই নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং পাকিস্তানের জোট নিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে মওলানা ভাসানী ছিলেন আপোসহীন। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী নীতির ঘোরবিরোধী। অন্যদিকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নীতি ছিল কিছু নমনীয়, অনেকটা ডানপন্থি। তাই আওয়ামী লীগের মধ্যে মওলানা ভাসানীর বামঘেঁষা নীতি এবং সোহরাওয়ার্দীর ডানপন্থার মধ্যে দেখা দেয় সংঘাত। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর ঢাকার সদরঘাটে অবস্থিত 'রূপমহল' সিনেমা হলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের তিন দিনব্যাপী দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনের সুদূরপ্রসারী গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো সংগঠনের দ্বার জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা। পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রধান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অসাম্প্রদায়িকীকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

পক্ষান্তরে সংগঠনের সাম্প্রদায়িক চরিত্র পরিবর্তনের প্রবক্তা ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। ২২ অক্টোবর ১৯৫৫ রাত প্রায় ৪ টার দিকে হোসেন সোহরাওয়ার্দী তার আপত্তি প্রত্যাহার করলে সংগঠনকে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ করার সিদ্ধান্ত স্থির হয়। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃত্ব সুদূরপ্রসারী যেসব কারণে 'আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ' নামকরণ করেন তা নিচে আলোচনা করা হলো-

১. **পূর্ব পাকিস্তানে পালিত ধর্ম :** পূর্ব পাকিস্তান তথা পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। দীর্ঘদিনের ইতিহাসের ধারায় এখানে বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী যেমন শাসন করেছে, তেমনি বিকাশ লাভ করেছে বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি আর বিশ্বাস। এ দেশের ৯০% লোক ছিল মুসলমান। দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হিসেবে ছিল হিন্দু। অন্যদিকে স্বল্পসংখ্যক বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান। তাই জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে এক রাজনৈতিক ধারায় পরিচালিত হওয়ার জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম আওয়ামী লীগ করা হয়।

২. **আন্দোলন-সংগ্রামে ধর্মনিরপেক্ষতা :** ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলেও দেখা যায়, এ দেশের বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেছে। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন এ দেশের মানুষ ধর্মীয় বাদ-বিচারের উর্ধ্বে ওঠে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লড়ছে। পাকিস্তানি শাসকরা যখন ধর্মের দোহাই দিয়ে বাঙালি জাতিকে শোষণ করছিল, তখন এ দেশের মানুষ সে শুভংকরের ফাঁকি ঠিকই বুঝতে পেরেছে। এ দেশের মানুষ জেনেছে ধর্মের দোহাই দিয়ে শোষণ করা কোনো শাসকের কাজ নয়।।

৩. **৫২ এর ভাষা আন্দোলন :** ইসলামী ঐক্যের নামে পাকিস্তানি শাসকবৃন্দ নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বাঙালিদের ওপর চাপিয়ে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর ফলে পূর্ব-বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় মনস্তাত্ত্বিকভাবে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি সুপ্ত বাঙালি স্বাতন্ত্রবোধকে পুণর্জাগরিত করে এবং মুসলিম জাতিয়তাবাদের ভিত্তিকে দুর্বল করে ফেলে। ভাষা আন্দোলন পূর্ব-বাংলায় বিরোধী দল তথা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথ প্রশস্ত করে। এ বিষয়টিও আওয়ামী লীগের নাম আওয়ামী লীগ করার একটি অন্যতম কারণ।

৪. **১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল :** পাকিস্তানের শাসকদল মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্টের স্বায়ত্তশাসন দাবিকে বিচ্ছিন্নতাবাদ বলে আখ্যায়িত করে এবং ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রধান নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণসহ পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ৩০৯টি আসনের মধ্যে ২২৮ টি আসন লাভ করে। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৯টি আসনসহ মোট সংখ্যা ২৩৬ মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৭টি আসন। যুক্তফ্রন্টের ২২৮টি আসনের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ পায় ১৪৩টি আসন, কৃষক শ্রমিক পার্টি ৪৮, নেজামে ইসলাম ২২, গণতন্ত্রী দল ১৩ এবং খেলাফতে রব্বানী পার্টি পায় ২টি আসন। অমুসলিম আসনে কংগ্রেস পায় ২৫টি, তফসিলী ফেডারেশন ২৭টি এবং সংখ্যালঘুদের যুক্তফ্রন্ট পায় ১৩টি আসন।

১৯৫৪ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে আরও প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব-বাংলার জনগণ তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এবং শুধু ধর্মের নামে তাদের সঙ্গে প্রতারণা করা যাবে না।

বাংলাদেশের লোকশিল্প

প্রচীণকাল থেকেই বাঙালিরা মৌসুমী কাজের অবসরের ফাঁকে ফাঁকে হরেক রকমের কারুশিল্প সৃষ্টি করতো। এগুলোর মধ্যে সুচি শিল্প, তাঁত শিল্প, নকশি কাঁথা ও মসলিন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গৃহিণীরা কাজের বিশ্রামে নকশিকাঁথা কিংবা নানারূপ কারুময় শিল্পকলা অনায়াসে সৃষ্টি করে ফেলতো এসবের সুনাম। বহুকাল আগে বিদেশেও ছড়িয়েছে। আমাদের লোকশিল্প আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের পরিচায়ক।

লোকশিল্পের পরিচয় : লোকশিল্প সাধারণ লোাকের জন্য সাধারণ লোকের সৃষ্টি। এর পরিধি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং প্রকৃতি এত বিচিত্র যে, এককথায় এর সংজ্ঞা নিরুপণ করা যায় না। অগাষ্ট প্যানিয়েলা (August Panyella) বলেন, লোকশিল্পের কেবল 'শিল্প শব্দ বোঝা কঠিন নয়, 'লোক' শব্দও সমান সমস্যাপূর্ণ। তাঁর ভাষায়, 'In the expression 'Folk art it is not only the word 'art that is difficult to understand, the word 'Folk' is equally problematic.'

Webster's New Collegiate Dictionary 'লোক'-এর ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছে : The great proportion of the members of a people the determines the group character and the tends to preserve its characteristics form of civilization and its customs, arts and crafts, legends, traditions and superstitions from generation to generation.

অর্থাৎ 'লোক' হলো সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশ যারা গোষ্ঠী চরিত্র নির্ধারণ করে এবং সভ্যতা, আচার, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, পুরাণ, চারু ও কারু শিল্পের বিশিষ্ট পকে বংশপরম্পরায় ধরে রাখে।
আর 'শিল্প' হলো মানব আনন্দিত উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ। শিল্প মানুষের সত্তার গভীরতম প্রকাশ। এবার দেখা যাক একত্রে লোকশিল্পকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

সবচেয়ে সহজলভ্য উপাদান মাটি থেকে আরম্ভ করে কাঠ, বাঁশ, বেত, পাতা, সুতা, লোহা, তামা-সোনা-রুপা, ধাতব দ্রব্য, সোলা, পাট, পুঁতি, ঝিনুক, চামড়া পর্যন্ত নানা উপাদান লোকশিল্প নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। কামার, কুমার, ছুতার, তাঁতি, কাঁসারু, সোনারু, শাঁখারি, পটুয়া প্রভৃতি পেশাদার এবং অন্য অনেক অপেশাদার নর-নারী লোকশিল্পের নির্মাতা। এরূপ বিভিন্ন ও শ্রেণী প্রকৃতির লোকশিল্পের সংজ্ঞায়নে সত্যিই দুঃসাধ্য ব্যাপার। এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকায় এরই প্রতিফলন ঘটেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, 'Although the definition of the folk art is not get firm, it may be considered as the art created among groups that exist within the framework of a developed society but for geographically or cultural reason, are largely separated from the sophisticated artistic developments of their time and that produced distinctive styles and objects for local needs and tastes.

অর্থাৎ যদিও লোকশিল্পের সংজ্ঞা এখনো নির্ণয় করা হযনি, তবু গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ যারা উন্নত সমাজের কাঠামোর মধ্যেই বিরাজ করে কিন্তু ভৌগোলিক অথবা সাংস্কৃতিক কারণে শিল্পের উন্নত ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাদের নির্মিত এই শিল্পকে লোকশিল্পরূপে বিবেচনা করা যায়, অবশ্য স্থানীয় চাহিদা ও রুচির কারণে এই শিল্প স্থানীয় বৈশিষ্ট্যসূচক রীতি ও বস্তুগুণ ধারণ করে।

লোকশিল্পের অপর একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন হ্যারল্ড ওসবোর্ন (Harold Osborne)। তিনি লিখেছেন, 'Objects and decorations made in a traditional fashion by craftsmen without formal training, either for daily use and ornament or for special occasion such as wedding and funerals are called folk art."

অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পায়নি এমন কারুশিল্পী প্রথাগত যেসব বস্তু ও সরঞ্জাম প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার, অলংকরণ, বিবাহ বা মৃতের সকারের কাজে তৈরি করে, সেসব শিল্পবস্তুকে লোকশিল্প বলে।

লোকশিল্পের ব্যবহারিক উপযোগিতা আছে সত্য, তবে এর নান্দনিক ও রসগত মূল্য উপেক্ষা করলে চলে না। সব কাঁথা লোকশিল্পের নমুনা নয়, নকশি কাঁথাই লোকশিল্পের নিদর্শনরূপে গণ্য হয়। কেননা এতে চিত্র আছে, রঙের ব্যবহার আছে, মটিফের বিন্যাস আছে, সর্বোপরি শিল্পীমনের স্পর্শ আছে। কুমার দেবমূর্তি গড়ে, তার হাতের স্পর্শে কোনোটি মনসা, কোনোটি সরস্বতী দেবীর রূপ লাভ করে, সজনশীলতার গুণেই এটি সম্ভব হয়। ব্রতের আল্পনায় ধর্মীয় আবেগ, বিয়ের আল্পনায় নান্দনিক আবেগ এবং একুশের আল্পনায় জাতীয়তার আবেগ আছে। চিত্রবস্তুর নির্বাচনে ও বিন্যাসে এরূপ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। এখানে শিল্পীর ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ না পেলেও পূর্বপুরুষের কাছ থেকে এক ধরনের হাতে-কলমে শিক্ষা পায় তারা, বাকিটা স্বভাব-প্রতিভার গুণে সৃষ্টির কাজ চালিয়ে নেয়। সুতরাং লোকশিল্পী পূর্বপুরুষের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করে সমাজের মানুষের চাহিদা ও উপযোগিতার কথা বিবেচনায় রেখে মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রথাগতভাবে যে শিল্প গড়ে উঠে, তাকেই লোকশিল্প হিসেবে আখ্যা দেয়া যায়।

➘ দি-জাতি তত্ত্ব

পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা। একজাতি একরাষ্ট্র এটিই হচ্ছে দ্বি-জাতি তত্ত্বের মূলমন্ত্র। তার মতে, হিন্দু ও মুসলমানেরা দুটি পৃথক জাতি। তাদের নাম পরিচয়ও আলাদা। তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান একত্রে আহার করে না। সুতরাং যে কোনো আন্তর্জাতিক মানদন্ডে মুসলমানেরা একটি পৃথক জাতি। তাই ভারতীয় উপমহাদেশে মুসমানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র থাকা প্রয়োজেন।

ময়মনসিংহ গীতিকা

ময়মনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন। এটি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে চারখন্ডে প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত সাবেক ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশে নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জের বিল, হাওর ও বিভিন্ন নদ-নদী প্লাবিত বিস্তৃত ভাটি অঞ্চলে বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকার যে শব্দগুলো বিকশিত হয়েছিল তাই 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে দেশে-বিদেশে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মৈমনসিংহ গীতিকায় এসব অঞ্চলের মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেছে। এ সমাজে নারীর স্বাধীন প্রেমের যে স্বীকৃতি রয়েছে তার অনুসরণে গীতিকাগুলোতে নারী চরিত্রের রুপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনীগুলো প্রেমমূলক এবং তাতে নারী চরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। নারীর ব্যক্তিত্ব, আত্মবোধ, স্বাতন্ত্র, সৎ বৈশিষ্ট্য এসব গীতিকায় বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে।

ম্যাডোনা- ৪৩

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের আঁকা একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রকর্ম হচ্ছে 'ম্যাডোনা-৪৩'। এটি ১৯৪৩ সালে (বাংলা ১৩৫০ সাল) বাংলার দুর্ভিক্ষের ওপর আঁকা বিখ্যাত সিরিজ চিত্রকর্মগুলোর একটি।

লালনগীতি এবং এর প্রভাব

বাংলার বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের রচিত আধ্যাত্মিক গানগুলো 'লালনগীতি' নামে পরিচিত। বর্তমানে সর্বমহলে এ গান সমাদৃত। লালনগীতিতে রয়েছে বেশ ভাবগাম্ভীর্যতা, মাধুর্যতা ও সুরের মোহ। এসব গীত কামনা-বাসনা, আশা ও আনন্দ-বেদনার এক আলোড়ন ও আবেগের সৃষ্টি করে। এ গানের অনুভূতি মন কেড়ে নেয়। সব গান থেকে এ গানের গতি, সুর স্বচ্ছতা একেবারে স্বকীয়। বাংলায় অন্য সব গানের তুলনায় এ গানের প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

লোকসাহিত্য

এক কথায় সাধারণ মানুষের মনের কথা, মুখের কথা ভাষা ও ছন্দে বাণীবদ্ধ হয়ে এবং লোকমুখে তা প্রচারিত ও প্রচলিত হয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাকে লোকসাহিত্য বলে। সমালোচকদের মতে, যে সাহিত্য লেখা হয়নি তালপাতার মূল্যবান গাত্রে, যে সাহিত্য পায়নি সমাজের উচুতলার লোকদের সমাদর, যে সাহিত্য পল্লীর সাধারণ মানুষের কথা বলেছে গানে গানে, যে সাহিত্যের রচয়িতার নামও অনেক সময় হারিয়ে গেছে, তাকে বলা হয় লোকসাহিত্য। এ সাহিত্য সাধারণ মানুষ ও পল্লীর আলোছায়া, ভালোবাসা ও স্মৃতিকে সম্বল করে বেঁচে আছে। আমরা অনেক ছড়া, গান, গীতিকা, গাথা পড়ি ও শুনি। কিন্তু জানি না সেগুলোর রচয়িতা কারা? এগুলো অনেক দিন ধরে বেঁচে আছে পল্লীর মানুষের কণ্ঠে। কোন কবি-সাহিত্যিক লিখেছিলেন এ বেদনাময় কাহিনী তাও আমরা জানি না। কিন্তু এগুলো বেঁচে আছে চিরকাল। সুতরাং বলা যায়, যে সাহিত্য কোনো বিশেষ ব্যক্তিচিন্তা বা সাধনা থেকে উদ্ভূত না হয়ে মানুষের মনে আপনা থেকেই জন্মায়, যার মধ্যে কোনো নিগূঢ় তত্ত্বকথা বা কোনো রকমের নীতি উপদেশ নিহিত থাকে না, কিন্তু নিতান্ত সরল প্রাণের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না প্রভৃতির অনাড়ম্বর প্রকাশ ঘটে এবং যা নিত্য পরিবর্তনশীল নদীস্রোতের মতো মানুষের মনে বিরাজ করে, তাকেই লোকসাহিত্য বলে। সাধারণ মানুষের মনের সহজ ও স্বচ্ছন্দ রুপায়ণ হলো লোকসাহিত্য। বাংলার লোকসাহিত্য বাঙালির স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ধারার প্রতিচ্ছবি। এ কারণেই লোকসাহিত্য শাশ্বত বাঙালি জাতির সম্পদ ও জাতির যুগ- যুগান্তরের হৃদয় ছবি।